অনীশ দেব

গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র

Arajakata Exclusive



বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যে অনীশ দেব আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চলে যাওয়ার পরেও তাঁর একের পর এক বই প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রতিটিই পাঠক সাগ্রহে নিয়েছেন।
সেই অনীশ দেবই যে সত্তরের দশকে নিয়ে এসেছিলেন এক ট্রাডিশনাল গোয়েন্দা চরিত্র, লেখকের যিনি সমনামী, 'গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী', তাঁর কথা ক'জনই বা জানতেন!
হারিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত লেখা নিয়ে এই 'গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র'।

১টি উপন্যাস

১টি উপন্যাসোপম কাহিনি

১টি বড় গল্প

৫টি ছোট গল্প

আশা করি, হারিয়ে যাওয়া গোয়েন্দাপ্রবর একালের পাঠকের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হবেন।

গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র

অনীশ দেব

গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র



পত্রভারতী

www.patrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২৪

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী® ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

অলংকরণ আশিস ভট্টাচার্য

GOENDA ANISH CHOUDHURY SAMAGRA
A Thrilling Compilaion of Detective Anish Choudhury's Cases
by Anish Dev
Published by PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

Price Rs. 275.00

ISBN 978-93-94913-83-7

হারিয়ে যাওয়া অনীশ

অনীশদার মুখে কখনও তাঁর এই গোয়েন্দা চরিত্রটির কথা আমি শুনিনি।

রহস্য রোমাঞ্চ সাহিত্যের সাচ্চা গবেষক, অকালপ্রয়াত সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়কে অনীশদা অসম্ভব স্নেহ করতেন। সে যখন নতুন করে 'রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিল, অনীশ দেব তাকে যে কীভাবে সাহায্য করেছেন, তার তুলনা হবে না। জনে জনে তাঁর স্নেহধন্য সকলকে সুমন্তর সদ্যোজাত পত্রিকায় লিখতে বলতেন। আমি তো অনীশদার চাপে পড়ে ওর পত্রিকার সেবারের পুজোসংখ্যার জন্য একটা উপন্যাস লেখাও শুরু করেছিলাম। দুর্ভাগ্য, মালিক হঠাৎ প্রয়াত হওয়ায় সেই সংখ্যা বেরোয়নি। আমার সে লেখাও কিছুটা হয়ে পড়ে আছে।

সুমন্ত তখন প্রায় প্রতি শনিবার অনীশদার সঙ্গে দেখা করতে পত্রভারতীর অফিসে আসত। এমনই একদিন সে হঠাৎ বলল, 'অনীশদা, আপনার কাছে নিশ্চয়ই নেই, হারিয়ে গেছে। আমি অনেক পুরোনো পত্র-পত্রিকায় দেখলাম। আপনার এক নতুন গোয়েন্দা চরিত্র।'

'কে?' অনীশদার ভ্রু কুঞ্চিত।

'অনীশ চৌধুরী। আমি খুঁজে খুঁজে বের করছি, তারপর ত্রিদিবদাকে দিয়ে দেব। আর কিছু পেলে বেশ একটা বই হয়ে যাবে।'

'আমার কাছে সব ফাইল কপি আছে।'

'সে কী! আপনি তাহলে বই করছেন না কেন?'

আমিও লাফিয়ে উঠলাম, 'এ তো দারুণ খবর। আমায় দিন প্লিস, পত্রভারতী বের করবে।'

অনীশদা হাসলেন। বললেন, 'ওগুলো প্রথম জীবনের লেখা। থিম বা সাবজেক্টে বেশ নতুনত্ব আছে, কিন্তু লেখার স্টাইলটা পুরোনো। ভালো করে ঘষামাজা করতে হবে। সময় পাচ্ছি না, ইউনিভার্সিটির প্রেসার, সায়েন্টিফিক পেপার লেখা, নতুন লেখার চাপ...দেখি, একটু সময় পেলেই করে ফেলব।

তারপর...,' একটু হেসে বললেন, 'পত্রভারতী ছাড়া আর কাকেই বা দেব। হ্যাঁ, আপনি না ছাপলে অবশ্য অন্য কথা।'

গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরীর লেখাগুলো, বলা বাহুল্য, অনীশ দেব হঠাৎ কোভিডে চলে যাওয়ার আগে সম্পাদনা করার সময় পাননি।

কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, অনীশ দেব এমন জাতের লেখক, যার কলমের স্ফুলিঙ্গ তাঁর যৌবনের লেখাতেও সমানভাবে ঝলসে উঠেছে। আর লেখার স্টাইল? সে নাহয় আজকের অনীশ দেবের অনুরাগী পাঠকই বিচার করুন। আমাদের কাজ, শর্মিলা বউদির সৌজন্যে অনীশ দেবের যে বিপুল পরিমাণ অগ্রন্থিত লেখা আমরা পেয়েছি, তাদের দুই মলাটে বন্দি করা।

আশা করি, পাঠককুল নিরাশ হবেন না। অনীশ চৌধুরী প্রফেসর এসিজি নন, একজন ট্রাডিশনাল রহস্যভেদী। কাহিনিগুলোর ফ্লেভার এখনও যথেষ্ট ফ্রেশ।

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

নভেম্বর ১, ২০২৪
কলকাতা



পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

কিশোর সাহিত্য

আমি সিরিয়াল কিলার বলছি
প্রতিঘাত সম্পূর্ণ
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভয়পাতাল
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

বিজ্ঞান। জানা অজানা

পাই নিয়ে রূপকথা
বিজ্ঞানের হরেকরকম
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু

বয়স্ক সাহিত্য

গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র
আগুন রঙের বুলেট
ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ
লাশতালাশ
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
বারোটি রহস্য উপন্যাস
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

গল্প



জটিল

[মোতি চৌধুরী এখন দার্জিলিং-এ মাসির বাড়ি আছে। অনীশ চৌধুরী একটা ঘর ভাড়া করে থাকেন কলকাতায়। রহস্যের জটিলতায় এটা অনীশ চৌধুরীর তৃতীয় পদক্ষেপ। তিনি এখন আনন্দ সান্যালের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাওয়ায় 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' নেমে এসেছেন। এ গল্পে সত্যান্বেষী অনীশ চৌধুরীর আর একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। —লেখক]

জুতোর দোকানে প্রবেশ করলেন অনীশ চৌধুরী। গাদা গাদা কর্মচারী এধারে-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সারি সারি চেয়ার পাতা খদ্দেরদের বসবার জন্য। ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছেন কয়েকজন। থাকে

থাকে জুতোর বাক্স দেওয়ালে সাজানো। এদিক ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন অনীশ চৌধুরী। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। আটটা-পাঁচ। নিয়নের আলোয় ঝকমক করছে জুতোর দোকানটা। গোটা কয়েক পাখা লাগানো। শীতের আমেজ পড়েছে বলে পাখাগুলো সচল নয়। দূরের এক কোনায়—বোধহয় ক্যাশিয়ারই হবে—একজন লোক বসে আছে, একটা ফতুয়া পরনে। পাগড়ি একটা মাথার উপর চাপানো। কপালে লম্বা তিলক কাটা। এদিক ওদিক অতি-ব্যস্ত ভাবে চাইছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে কোনো কোনো কর্মচারীকে সতর্ক করছিলেন ডেকে ডেকে। তার ঠিক বাঁ-দিকে একটা দরজা, কাচের উপরে লাল আলোয় লেখা, প্রবেশ নিষেধ।

কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন কর্মচারী বসে বসে জুতো সেলাই করছে। একজন স্টেনো টাইপ করছে একমনে। দু-একজন অফিসার গোছের লোক ফাইল হাতে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে।

অনীশ চৌধুরী সোজা এগিয়ে গেলেন ক্যাশে বসা লোকটির কাছে। লোকটি তাকে দেখে বলল, কিছুটা ব্যস্ত আর চমকিত ভাবে, 'রাম, রাম, চৌধুরী সাহাব, এখানে কি মনে করে?' অনীশ চৌধুরী কাঠের পার্টিশনের ওদিকে ঢুকে এগিয়ে গেলেন লোকটির দিকে, বললেন, 'সুরজমলজী, আমি ওয়েটিং রুমে আছি। দোকান বন্ধ হলে একবার আসবেন। জরুরি কথা আছে।' দ্রুতপদে কাউন্টার ত্যাগ করলেন অনীশ চৌধুরী। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করলেন গিয়ে ঠিক অপর দিকের ওয়েটিং রুমে।

'সুরজমল শেঠদের দোকান ঠিক শহরের কেন্দ্রস্থলেই বলা যায়, মিঃ চৌধুরী। ওর বাপ-দাদা যা ব্যবসা করত ও সেই ব্যবসাই আঁকড়ে রেখে এত বড় করেছে। এখন শেঠ অ্যান্ড কোং একটা নামকরা প্রতিষ্ঠান। অথচ শুনেছি সুরজমল শেঠের বাবা নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে কোনোরকমে এই জুতোর দোকানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতদিনে সেই ছোট দোকানটাকে এত বড়তে পরিণত করেছে এই সুরজমল শেঠ। অথচ দোকানের আয়তন খুব একটা বাড়েনি, কিন্তু কর্মচারীর সংখ্যা সেই অনুপাতে প্রচুর। ওদের আবার একটা প্রাইভেট রুমও আছে,

যেখানে এই শহরের বেশির ভাগ গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হতে পারে, তারা সকলেই শেঠ অ্যান্ড কোং-এর খদ্দের, কেউ পুরোনো আর কেউ নতুন। তবে খদ্দেরের সংখ্যা এত প্রচুর যে একটু অতি-অতি মনে হয়। আপনি সেখান থেকে একবার ঘুরে আসুন, মিঃ চৌধুরী। মনে হয় এর তলায় ব্যাপার আছে। আমার সন্দেহ নেহাৎ ভিত্তিহীন নয়, অনীশবাবু; আমি আমার ইনফর্মারদের সাহায্যে সংবাদ পেয়েছি যে, যারা ওই সুরজমল শেঠের জুতোর দোকানের খদ্দের তারা প্রায় প্রতি দুইজনে একজন করে একটি বিশেষ প্রকারের মাদক দ্রব্যের বশীভূত। তারা ওই শেঠ কোম্পানি থেকেই তা সংগ্রহ করে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কোনো ডাইরেক্ট প্রুফ নেই। তাই আমরা কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার আশা আছে আপনার উপর, মিঃ চৌধুরী। মনে হয় আপনি একটু খোঁজ নিলেই পারবেন। তাই বলছি আপনি একবার ঘুরে আসুন ওই রিমার্কেবেল দোকানটা থেকে। দিন কয়েকের মধ্যেই মিটে যাবার ব্যাপার হয়তো, আমরা ঠিক আসল প্যাঁচটা ধরতে পারছি না, তাই। আচ্ছা, উইশ ইউ গুড লাক, মিঃ চৌধুরী।'...

আনন্দ সান্যাল, পুলিশ ইন্সপেক্টর আনন্দ সান্যালের কথাগুলো কানে বাজছিল অনীশ চৌধুরীর। ধীর পদে তিনি প্রবেশ করলেন ওয়েটিং রুমে। আনন্দ সান্যাল বলেছিল, 'যারা ভেতরের খবর জানে, মানে, আসল খদ্দের, তারা প্রত্যেকেই সিধে ওয়েটিং রুমে যায়। তেমন আপনিও যাবেন। তারপর কী করতে হবে তা নিশ্চয়ই আপনাকে আর বলে দিতে হবে না।'...

কিন্তু অনীশ চৌধুরীকে সুরজমল শেঠ চেনে যে সে সত্যান্বেষী। তার সাবধান হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু অনীশ চৌধুরীকে আরও সাবধান হতে হবে। কারণ এই সুরজমল শেঠ লোকটি নেহাৎ সরল ও সোজা নয়।

ওয়েটিং রুমে ঢুকেই যার সঙ্গে প্রথমে চোখাচোখি হল অনীশ চৌধুরীর তিনি প্রফেসর সত্যকাম বক্সী। তাকে দেখে মোটামুটি অবাক হলেন অনীশ চৌধুরী। শেষকালে তিনি এখানে! তাকে তো অনেক

জায়গায় আগে দেখেছেন অনীশ চৌধুরী। অনেকেই এক ডাকে চেনে প্রফেসর সত্যকাম বক্সীকে। তার মতো নীতিবাগীশ লোকও এই দুর্নীতির পথে!

প্রফেসর অবশ্য কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন চোখে একটা কালো সানগ্লাস লাগিয়ে। এই রাত্রিবেলায়ও। তবু সবার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

অনীশ চৌধুরী এগিয়ে গেলেন প্রফেসরের দিকে। তার পাশের সোফাটা দখল করলেন। প্রফেসর বারকয়েক আড়চোখে তাকালেন অনীশ চৌধুরীর দিকে। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

ঠিক এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন সুরজমল শেঠ। সবাইর ওপর দিয়ে একবার শীতল চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন খ্যাঁ খ্যাঁ করে। তারপর গলার ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁসে কণ্ঠস্বরটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, 'আসেন, আমার সঙ্গে আসেন আপনারা। অনেক দেরি করিয়ে দিলাম আপনাদের। চলেন, প্রাইভেট চেম্বারে চলেন।'

শেঠের কথায় সবাই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শেঠকে অনুসরণ করে একটার পর একটা চেয়ার ছাড়িয়ে সবাই এগোলেন 'নো অ্যাডমিশন' লেখা ঘরের দরজার দিকে। দরজা পার হয়ে বাঁয়ের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে তারা প্রবেশ করলেন 'প্রাইভেট' লেখা একটা ছোট ঘরে। ঘরে ঢুকলে দেখা গেল চেয়ার টেবিলে সুসজ্জিত সেটা। আর একটা দরজা রয়েছে ডান দিকে। যেটা দিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করা যায়। শেঠ সবাইকে প্রথমে এই ঘরে বসাল। তারপর কলিংবেল টিপে শব্দ করে বেয়ারাকে ডাকল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বেল টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল অন্তত দশজন কর্মচারী, শেঠ ইশারা করে খদ্দেরদের দেখিয়ে দিয়ে নিজে একা পাশের ঘরে প্রস্থান করলেন।

এইবার চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাখলেন সত্যকাম বক্সী। অনীশ চৌধুরী আর একবার তাকালেন তার দিকে।

একটু পরেই ও-ঘর থেকে বেল বাজল। একটা কর্মচারী এসে উঁকি

দিল, ডাকল, 'প্রফেসর বক্সী, আপনি আসুন, মালিক ডাকছেন।' কর্মচারীটা চলে গেল।

প্রফেসর বক্সী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রস্থান করলেন। অনেকক্ষণ ধরে শেঠজীর ও প্রফেসরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারও কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন সত্যকাম বক্সী, একজন কর্মচারী পেছনে যাচ্ছে, হাতে একটা জুতোর বাক্স।

এরপর একে একে ডাক পড়ল প্রত্যেকের। প্রত্যেকেই জুতোর বাক্স হাতে করে প্রস্থান করলেন। বসে বসে ঘেমে উঠেছিলেন অনীশ চৌধুরী, যে দুজন লোক তার পাশে অপেক্ষা করছিল তারা তাড়াতাড়ি করে এসে তার কোটটা গা থেকে খুলে দিল, তারপর ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

ঠিক এমন সময় ডাক পড়ল অনীশ চৌধুরীর। তিনি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। একটা মৃদু শেড দেওয়া আলো জ্বলছে। একটা ছোট গোল টেবিল। দুটো চেয়ার। দেওয়ালে দু-একটা বাঁধানো ফটো ঝুলছে। আর কোনো আসবাবপত্র নেই। অনীশ চৌধুরী এতক্ষণ দেখে দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলেন। তাই বললেন, 'শেঠজী, বহুত দরদ হয়, একজোড়া দামি জুতো চাই।' 'দামি' কথাটার উপর জোর দিলেন অনীশ চৌধুরী।

—'পাবেন, পাবেন চৌধুরী সাহাব, লেকিন দরটা তো আপনার জেনে নেওয়া দরকার।'

—'দর আমি জানি শেঠজী, এই নিন,' কতকগুলো নোট এগিয়ে দিলেন অনীশ চৌধুরী, সুরজমল শেঠ খামচা মেরে নোটগুলো নিলেন, তারপর বেল বাজিয়ে বললেন, 'দামি জুতো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন কর্মচারী একটা জুতোর বাক্স হাতে করে হাজির হল। সুরজমল তখন বললেন, 'সিগ্রেট খাবেন নাকি, চৌধুরী সাহাব?'

—'আপত্তি নেই।' সুরজমল একটা শৌখিন বড় সাইজের লাইটার বের করে নিজের ও অনীশের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। অনীশ চৌধুরী তখন তাকিয়েছিলেন টেবিলের উপর রাখা একটা ৬ বাই ৩ সাইজের বুদ্ধমূর্তির দিকে। সত্যিই খুব সুন্দর বুদ্ধমূর্তিটা, খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য।

সুরজমল শেঠ নস্যির কৌটা বার করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'আপনার অভ্যাস আছে নাকি, চৌধুরী সাহাব?'

—'নাঃ, আজ উঠি,' উঠে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী, বললেন, 'আবার দরকার পড়লে আসব শেঠজী।'

—'জরুর, জরুর, আপনেদের অসুবিধা দূর করাই তো আমার কাজ। আচ্ছা গুড বাই।'

বাইরের ঘরে এসে কোটটা পরে নিলেন অনীশ চৌধুরী, তারপর দোকান পেরিয়ে যখন রাস্তায় নামলেন তখন তার হাতে অমূল্য সেই দামি জুতো। বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। জুতোটা উল্টেপাল্টে দেখতে হবে।

•

অনেকক্ষণ ধরে জুতোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পরও যখন ফল পাওয়া গেল না তখন অনীশ চৌধুরী হতাশ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, তবে কি তার ধারণা ভুল? কিন্তু তা তো হওয়ার কথা নয়! যা হোক সবকিছু চেষ্টাই ব্যর্থ হতে দেখে অনীশ চৌধুরী জুতোটাকে ছুরি দিয়ে চিরে দেখবেন ঠিক করলেন। কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন ছুরি বার করবার জন্য। কিন্তু হাত ঢোকাতেই হাতে ঠেকল একটা কাগজের মোড়ক। বার করলেন সেটাকে খুলে মেলে ধরলেন হাতের তালুর উপর। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করলেন কাগজের মধ্যে সাদা গুঁড়ো পদার্থ, যার লোভে সব উপরতলার লোকেরাও ছুটেছে সুরজমল শেঠের দোকানে, পদার্থটা আর কিছুই নয়, কোকেন। এইবার বুঝতে পারলেন অনীশ চৌধুরী, তার কোটটা খুলে পাশের ঘরে ঢোকার পরই কোনো কর্মচারী শেঠজীর নির্দেশে কোটের পকেটে কোকেনের মোড়কটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

শেঠজী অত বোকা নয়। এমন কোনোই প্রমাণ নেই যে শেঠজীর দামি জুতোর সোলের ফাঁপা অংশের ভেতর কোকেন থাকে, বললে লোকে হাসবে, বিশ্বাস করবে না। বলবে, 'কোথায় কে আপনার পকেটে ফেলে গেছে মশাই—'

নিজেকে মনে মনে গালাগালি দিলেন অনীশ চৌধুরী। শেঠজীর প্যাঁচ তার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল।

তাছাড়া যারা ওখান থেকে কোকেন নেয় তারা কিছুতেই ওই কথা স্বীকার করবে না। কারণ, তাহলে তারা নেশার জিনিস আর পাবে না।

নাঃ, শেঠজীর দোকানে একবার যেতেই হবে কাল। এবার আর কোটের পকেটে ফেলে দেওয়ার সুযোগ দেবে না। কিছুতেই নয়।

সুরজমল শেঠ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। অনীশ চৌধুরীকে দেখে কেমন হাসলেন খ্যাঁ-খ্যাঁ করে, দাঁত বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চৌধুরী সাহাব, আপনের জিনিসপত্র পেয়েছেন তো?' রাগে অনীশ চৌধুরীর সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল, তবু নিজেকে সংযত করে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'পাবারই তো কথা, চৌধুরী সাহাব, লেকিন কখন সখনও গলতি হয়ে যায় তো, তাই। আসেন প্রাইভেট চেম্বার-এ আসেন, আজও লাগবে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, চলুন, ভেতরেই কথা হবে।' শেঠজীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট চেম্বারের দিকে এগোলেন অনীশ চৌধুরী। আজ সুযোগ না দেবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।

শেঠজী সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন অনীশ চৌধুরীকে। আজ আর কেউ আসেনি, বা আগে এসে নিয়ে গেছে। টেবিলের উপর সেই বুদ্ধমূর্তিটা বসানো। ওটার পাশেই কলিংবেলটা রাখা।

শেঠজী ঘুরে গিয়ে অপরদিকের চেয়ারে জুৎ হয়ে বসলেন, তারপর অর্থবহভাবে হাতটা বাড়ালেন অনীশ চৌধুরীর দিকে। অনীশ চৌধুরীর চোখ ছিল বুদ্ধ মূর্তিটার দিকে, চমকে ফিরে তাকালেন, একবার শেঠজীর হাতের দিকে, একবার মুখের দিকে, তারপর বললেন, 'ওঃ, হ্যাঁ এনেছি, এই নিন,' বলে আবার পূর্বেকার মতো এক এক করে কতগুলো নোট গুনে গুনে শেঠজীকে দিলেন। শেঠজী নিঃশব্দে হাসলেন। হাত বাড়িয়ে

নোটগুলো নিয়ে পাশের ড্রয়ারে রাখলেন। তারপর বেল টিপে একজন বেয়ারাকে ডাকলেন, বললেন, 'চা লাও, জলদি।'

—'এখন আবার চা কীসের, আমি এখন চা খাব না, দিন তাড়াতাড়ি, জিনিস নিয়ে চলে যাই,' অনীশ চৌধুরী ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন।

—'কিছু দেরি হবে না, চৌধুরী সাহাব, একটু ওয়েট করুন, মাল আর চা দুই চলে আসবে।' পকেট থেকে নস্যির কৌটা বার করে দু'টিপ নস্যি নিলেন, হাসলেন, বললেন, 'অনেকদিনের অভ্যাস, ছাড়তে পারি না।' তারপর সিগারেট বার করে দিলেন অনীশ চৌধুরীকে। নিজেও নিলেন, তারপর দেশলাই বার করলেন,—বাধা দিলেন অনীশ চৌধুরী। 'কেন, লাইটার কিকী হল শেঠজী?'

—'ও। আচ্ছা,' বলে তাড়াতাড়ি এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'আমার মোটেই মনে ছিল না যে লাইটারটা পকেটে আছে।' বলে আবার সেই গা জ্বালানো হায়নার হাসি।

এই সময় চা এল, সঙ্গে বিস্কুট। চা খাওয়ার পর যখন অনীশ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন তখন এক ঘণ্টা কেটে গেছে। একজন কর্মচারী জুতোর বাক্সটা নিয়ে এল, অনীশ চৌধুরী সেটা নিয়ে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন।

আজ তিনি অতি-সতর্ক ছিলেন। মনে হয় আজ হয়তো জিনিস নেই, নয়তো এই জুতোর মধ্যেই আছে। বাড়ির দিকে চললেন অনীশ চৌধুরী।

. . .

দরজার তালা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন অনীশ চৌধুরী। কোট খুলে, জুতোর বাক্সটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখলেন। দরজাটা বন্ধ করে এসে বাক্স খুলে জুতো-জোড়া বার করলেন। এমন সময় তার হঠাৎ দৃষ্টি গেল জানালার তাকে। একটা চিঠির মতো, পাশে একটা মোড়ক।

দৌড়ে গিয়ে তুলে নিলেন ওই দুটো। প্যাকেটে সেই কোকেন। আর

চিঠি খুললেন, পড়লেন, ইংরাজিতে টাইপ করা চিঠি। চিঠির কাগজে একটা টাইপ—স্কুলের নাম, উপরের দিকে। মানে পয়সা দিয়ে কোনো স্কুল থেকে টাইপ করা এ চিঠি। চিঠির ভাষায়ও সামঞ্জস্য নেই, সাধারণ। কেউ শুধু চিঠি পড়লে ভাববে, এ সাধারণ চিঠি ব্যবসার খাতিরে লেখা চিঠিটা ঠিক এই রকম।—

প্রিয় মহাশয়,

মনে হয় আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি পেয়েছেন। আরও প্রয়োজন হলে জানাবেন।...

লোকটার মাথায় যে এত প্যাঁচ, তা অনীশ চৌধুরী ধারণাতেও আনতে পারেননি। বোধহয় আগের দিনই তার বাড়ি দেখে গেছিল কাউকে পাঠিয়ে।

সেইজন্য আজ এত চা খাওয়ার ঘটা। অন্ধ আক্রোশে অনীশ চৌধুরী একটা টেবিলের উপর ঘুষি মারলেন।

পরের দিন আবার গেলেন শেঠের দোকানে। শেঠ তখন প্রাইভেট চেম্বারে ছিলেন। একজন চেনা কর্মচারী অনীশ চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গেল।

পূর্বেকার সেই ঘরে শেঠ বসে আছেন। একটা মৃদু শেড দেওয়া আলো জ্বলছে। অনীশ চৌধুরীকে দেখেই শেঠ বললেন, 'আরে বসেন, চৌধুরী সাহাব, আপনি মাল পেয়েছেন তো? আড়চোখে তার দিকে তাকালেন সুরজমল শেঠ।

অনীশ চৌধুরী কোনো উত্তর দিলেন না। বললেন, 'শেঠজী, আর জুতো নেব না, আজ এই বুদ্ধ মূর্তিটা কিনব? কোনো অসুবিধা আছে?'

—'তা নেই বললে, মিথ্যে কথা বলা হবে, চৌধুরী সাহাব। মানে, ঘরের শোটা খতম হয়ে যাবে, কি বলেন? ঠিক নয়?' চোখ গোল গোল করে তাকালেন সুরজমল শেঠ।

—'কিন্তু আমি কিনতে চাই।' অনীশ চৌধুরীর গলায় হিমশীতল ভাব।

—'তা নিন, আপনি যখন বলছেন,' নিমরাজি হলেন শেঠজী।

সঙ্গে সঙ্গে টাকা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন অনীশ চৌধুরী, হাতে মূর্তিটা। আজ এটাকেই ভেঙে দেখবেন। থাকলেও থাকতে পারে।

গাড়ি করে যাচ্ছিলেন অনীশ চৌধুরী। সঙ্গে ইন্সপেক্টর আনন্দ সান্যাল আর চারজন সেপাই। আনন্দ সান্যালের হাতে সার্চ ওয়ারেন্ট, আজ তারা সুরজমল শেঠের দোকান সার্চ করবেন।

—'মূর্তিটা সাধারণই আনন্দ, কিছুই পাইনি ওতে।' অনীশ চৌধুরীর হতাশ কণ্ঠস্বর।

—'সুরজমল লোকটা সাংঘাতিক ঘাগু মাল, অনীশ; আমার মনে হয় আজও আমরা ব্যর্থ হব, তবু দেখা যাক।' আনন্দ সান্যাল উত্তর দিলেন।

তিনদিন কেটে গেছে। কোনোই লাভ হয়নি দোকান সার্চ করে। কিছুই পাওয়া যায়নি সন্দেহজনক। নিজের ঘরে বসেছিলেন অনীশ চৌধুরী। আর ভাবছিলেন। কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ কী মনে হতে কোটটা হাতে নিলেন তিনি, তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়, পা বাড়ালেন শেঠের দোকানের দিকে।

শেঠ তখন দোকানেই ছিলেন। অনীশ চৌধুরীকে দেখে ডাকলেন ইশারা করে, তারপর কাছে গেলে বললেন, 'চৌধুরী সাহাব কী ব্যাপার। ওয়ারেন্ট আছে নাকি অ্যাঁ?'

এই পর্যন্ত বলে খক খক করে কাশতে থাকলেন শেঠজী। কাশি থামলে মুখটা মুছে বললেন, 'এই শালার কাশিটা, ঠান্ডা লেগে হঠাৎ সর্দি হয়ে গেল। যাক সিগ্রেট খাবেন?' এই বলে সিগারেট বাড়িয়ে

ধরলেন শেঠ অনীশ চৌধুরীর দিকে। অনীশ চৌধুরী হাত বাড়িয়ে নিলেন সিগারেটটা। শেঠ লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলেন। অনীশ চৌধুরীর চোখদুটো চকচক করে উঠল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তিনি শেঠজীর দিকে।

শেঠজী হাসলেন, বললেন, 'কী বেপার?'

—'না, কিছু না, এমনিই। আচ্ছা শেঠজী এই লাইটারটি কি অনেক দিনের পুরোনো?' অনীশ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

—'হ্যাঁ, তা পাঁচ সাল হল।' বলতে বলতে নস্যির কৌটা বার করে শেঠ এক টিপ নস্যি নিলেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন। বললেন মুচকি হেসে, 'চৌধুরী সাহাব কেন এলেন তা তো কই বললেন না। আপনার মতো লোক এমনিই আসবে তা আমার বিশ্বাস হয় না। বলুন, কী বেপার?'

—'শেঠজী, আপনি একজোড়া জুতো আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন, এই নিন টাকা।' দু-এক মিনিট ভেবে অনীশ চৌধুরী টাকা বার করে দিলেন, তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালেন। শেঠজী সঙ্গে সঙ্গে এগোলেন হাতের টাকাগুলো গুনতে গুনতে।

সদর দরজায় পৌঁছে অনীশ চৌধুরী বললেন, 'চলি আজ শেঠজী, কাজ আছে একটু।'

—'আচ্ছা আসেন...' বলেই শেঠজী নাক ঝাড়লেন রাস্তায়, তারপর একটা সিগারেট বার করে লাইটার দিয়ে ধরালেন। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রস্থান করলেন দোকানের ভেতর।

অনীশ চৌধুরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন শেঠজীকে।

পরের দিন সকাল দশটা। অনীশ চৌধুরী আর আনন্দ সান্যাল চলেছেন শেঠা অ্যান্ড কোং-এর দিকে।

দোকানে ঢুকে দেখেন শেঠ সুরজমল সিগারেট খাচ্ছে একধারে দাঁড়িয়ে।

অনীশ চৌধুরী আর আনন্দ সান্যাল এগিয়ে গেলেন। হাত পাতলেন

তার কাছে। শেঠজী মৃদু হেসে একটা করে সিগারেট দিলেন দুজনের হাতে তারপর লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিলেন।

আনন্দ সান্যাল গা টিপলেন অনীশ চৌধুরীর। সঙ্গে সঙ্গে অনীশ চৌধুরী পেছন থেকে জাপটে ধরলেন শেঠকে। আনন্দ সান্যাল হুইসেল বাজালেন। গোটা কয়েক পুলিশ-প্রহরী প্রবেশ করল দোকানে। শেঠজীকে ঘিরে দাঁড়াল।

আনন্দ সান্যাল হাত পাতলেন শেঠের দিকে, বললেন কঠিন স্বরে, 'সুরজমলজী সিগ্রেট নয়, লাইটারটাই চাচ্ছি আমি। দিন শিগগিরই।'

—'দিচ্ছে, বাবুজী দিচ্ছে—এই নিন।' শেঠজীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে। ঠিক এমন সময় কথা বললেন অনীশ চৌধুরী, 'আনন্দ, কিছুই পাবে না ওতে। তোমার ভুল হচ্ছে। এই দেখ,' বলে এক টান দিয়ে বার করে আনলেন শেঠজীর নস্যির কৌটোটা, 'এতেই পাবে কোকেনের সন্ধান, এই নাও,' ওটা এগিয়ে দিলেন অনীশ চৌধুরী, আনন্দ সান্যালের দিকে।

খুললেন আনন্দ সান্যাল। তার চোখ নেচে উঠল, আসল জিনিস পেয়েছেন তিনি।

বন্দি হলেন অ্যান্ড কোং-এর প্রোপ্রাইটার সুরজমল শেঠ।

আনন্দ সান্যাল আর অনীশ চৌধুরী বসেছিলেন। অনীশ চৌধুরী বলছিলেন, 'আনন্দ, এই সুরজমল শেঠ লোকটি অতি ধূর্ত। আমি প্রথমে সন্দেহও করিনি যে নস্যির কৌটোয় কোকেন আছে। আমিও তোমার মতোই প্রথমে ভেবেছিলাম যে লাইটার কিংবা বুদ্ধ মূর্তির মধ্যেই কোকেন আছে। প্রথমদিন শেঠ আমাকে নস্যি অফার করল। ও জানত যে আমি রিফিউজ করব। ওর দুটো নস্যির কৌটো ছিল। একটা সব সময় সঙ্গে রাখত আর একটা ওর কর্মচারীদের কাছে থাকত। যে সব লোক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তাদের থেকে ও মোটা টাকা লাভ করত।

'যা হোক, গত সোমবার আমি যখন দোকান থেকে বেরিয়ে আসছি

তখন শেষ নাক ঝাড়ল। আমি প্রথমে সন্দেহও করিনি, আমার লক্ষ তখন লাইটারটির ওপর। হঠাৎ ভাবলাম দেখি না একবার যদি পাওয়া যায়। সন্দেহ নিরসনের জন্য কাগজে করে সেই নাক ঝাড়া পদার্থটিকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে গেলাম। ওরা বলল এতে অন্য কিছু নেই। কিন্তু তুমি জানো যে যারা নস্যি নেয় তাদের কফের সঙ্গে নস্যির গুঁড়ো থাকার কথা। কিন্তু শেঠের বেলায় নেই কেন?

'তবে কি ওর কৌটোয় নস্যি নেই? অন্য কিছু? তবে ও যে নস্যি নেয় না তা ঠিক, তবে? তবে কী সেটাই বলছি শোনো। ও সব সময় কৌটোটা খুলে নস্যি নেওয়ার ভান করত। খালি বুড়ো আর তর্জনী আঙুল দুটো কিন্তু টিপে ধরার ভঙ্গী করে বার করে আনত, যাতে সবাই মনে করে নস্যি আছে আঙুলে চাপা। আসলে ওটা একটা ধোঁকা। একটা মিথ্যে নস্যি নেওয়ার ভান করা।

'বুঝেছ এবার? ওর জুতোর সোলের ফাঁপা অংশেই কোকেন থাকত। আমার বেলায়, আমি বলে নিয়ম চেঞ্জ হয়েছিল। যারা ওর থেকে কোকেন নিত তারা ব্যাপারটা প্রকাশ করলে নেশার জিনিস পাবে না বলে প্রকাশ করত না। আশাকরি প্রফেসর সত্যকাম বক্সী এবার সৎপথে ফিরবেন।'

আনন্দ সান্যাল অনীশ চৌধুরীর হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'অনীশ কনগ্র্যাচুলেশনস্।'



অবদান

[এটা অনীশ চৌধুরীর লক্ষ্যভেদ নয়। একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ। অপরাধীকে একটা নতুন চোখে দেখতে শিখলেন তিনি।]

সোফাসেটে গা ঢেলে বসেছিলেন অনীশ চৌধুরী। সামনে টেবিলের উপর খানকতক চিঠি। তার মধ্যে একটা একটু স্বাস্থ্যবান—মানে মোটাসোটা। এক এক করে পড়তে লাগলেন তিনি। পড়া হয়ে গেলে সবার শেষে তুললেন মোটা খামটা। মুখ ছিঁড়ে বার করলেন পাণ্ডুলিপি গোছের একগাদা হাতে লেখা কাগজ,—পিন দিয়ে মুখ আঁটা। পড়তে আরম্ভ করলেন অনীশ চৌধুরী। ঝরঝরে হাতের লেখা—কিন্তু অজস্র ভুলে ভরা। কাগজটাও খুব একটা দামি নয়। চিঠি শুরু হয়েছে...

চৌধুরীবাবু সমীপে,
..., গৌরীবাড়ি লেন।
কলিঃ—৪

জিলা—পৃথিবী
ঠিকানা—ভারত
তারিখ ২৮/১১/৬৮

সার,

চিঠি পেয়ে চমকে যাবেন না। আমার নাম সারস্বত সরখেল। ভগবান বত্রিশের বদলে চৌত্রিশটা দাঁত দিয়েছে বলে এক্সট্রা দাঁত দুটো সব সময় বেরিয়ে থাকে। লোকে তাই আমার ঠাঁ'মার রাখা সুন্দর নামটা পাল্টে রেখেছে 'দাত্তু সরখেল।' আপনিই বলুন সার, 'সারস্বত' নামটা কি খারাপ? তবু বুঝি না এরা কেন আমায় রাগায়।

এখন বসে বসে চিঠি লিখছি। আমার ঘরে তো বসবার জায়গা বলতে মাটি। এখন বোসে, মানে চেয়েরে বোসে। সামনের যে পান দোকানটা, সেটা পাচুগোপাল চালায়,—জানেন সার, পাচুর কলজের সঙ্গে ওর পয়সার যোগ আছে। একটা পয়সা নিয়েছেন কি ওমনি শালা হার্টফেল কোরবে। ও শালা যে আমায় বোসতে দিয়েছে তা আমার বাবার ভাগ্যি। আবার একটা টুলও দিয়েছে লেখবার জোন্য।

আগে সার আমি এমন ছিলুম না, সোত্যি! বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল আমার বাপের। সব,—সব পেয়েছিলুম আমি। এখন মোনে পড়লে দুঃখু হয়, স্যার। লেখাপড়া তো কোনোদিনই কোরিনি। শুধু মা-টা শিখিয়েচিল বন্নপরিচয়,—(সেই যে সার, পড়েননি, ধুর ছাই—কী যেন, কোন এক মানুষের লেখা।) কী কঠিন মাইরি কী বোলব। আমি তো পড়তে পড়তে হাল্লাক হোয়ে গেলুম। তবু বাবার সব সম্পত্তি পেয়ে কী ভাবে হারালুম তাই ভাবি। কোনদিক দিয়ে যে সব ফরসা হোয়ে গেল কে জানে।

আপনাকে আরও একটা কথা বোলব সার। আমি কিছুদিন আগে একটা খুন কোরেছি। সত্যি বলছি—খুন। অথচ ভাবতেও আশ্চর্যো লাগে, শেষে কিনা আমার প্রাণের দোস্, জানের দোস্ মাতোগুো নারায়ণ উপাধ্যায়কে আমিই খুন কোরলাম। কিন্তু স্যার, ও কিন্তু সত্যিই দোষ কোরেছিল। কী দোষ কোরেছিল তা যোদি জানতে চান তবে সবই প্রথোম থেকে বোলতে হয় সার। তখোন আমার বয়স তেরো বছর; বাবা নতুন বাড়িতে আমাদের নিয়ে উঠে গেলেন। মস্তো চারতলা বাড়ি, গ্যারেজ ছিল, গাড়িও ছিল। ক'দিন বাদে আমার সঙ্গে আলাপ হল 'মাতো'র,—আমি স্কুল যাচ্ছিলুম, ও রকে বোসে ছিল—আমায় দেখে ডাকল। তখন দিন কয়েক হল বাবা জোর কোরে নাইট ইশকুলে ভোর্তি করেছেন।...'মাতো' লেখাপড়া জানত সেবেন পর্যোন্ত,—পরে শুনেছিলুম ওর থেকে...

—'এই শোন।' আমি দাঁড়িয়ে পোড়লুম সার, এগোলুম ওর দিকে, তারপোর জিগ্যেস কোরলুম, 'কেন ডাকছ?'—'আয় বোস', আমি গিয়ে পাশে বোসলুম। সোত্যি সার, এ্যাদ্দিন পর পোড়া ইশকুলে যেতে আর ভালো লাগছিল না। ও বোলল, 'সিগ্রেট খাস?' আমি সার, জানতুম সিগ্রেট খেতে ভালো, বাবা মারবে তাই কোনোদিন খাইনি। বললুম, 'জানি ভালো, এখোনো খাইনি।'—'সে কী র‍্যা?' মাতো চমকে উঠে বোলল, 'খাসনি এখনো?' আমি সাহোস এনে বোললুম, 'আছে তোমার কাছে?'—'খবরদার, তুমি, ফুমি বোলবিনে, সব সময় তুই, দোস্ ইয়ার এইসব বোলবি, নে ধর'—আমি সার টেস কোরলুম একটা। মন্দো নয়। মাতো এমন সময় বোলল, 'বই-টই নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?'

—'পড়তে,' ভয়ে ভয়ে বোললুম, 'ও সিগ্রেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বোলল, 'তোর বাপের পাত্তি আছে, তোর আর কী ভাবনা,—যার বাপের পয়সা আছে সে কিছু করে না। এখন যা বইপত্তোর সব বাড়ি রেখে আয়, আড্ডা মারব।'—ওর

কথা অক্ষোরে অক্ষোরে পালোন কোরলুম,—ভয়ে ভয়েই একরকোম। বাড়ি গিয়ে বই রেখে আবার ফিরে এলাম।

মাতো বোলল, 'পয়সা বার কর। সিনেমা যাব।' আমি সার আনন্দে রাজি হোয়ে পয়সা বার করলাম তারপর দু'জোনে মিলে সিনেমা গেলাম।

এ তো গেল সার প্রথোম দিনের কথা। এরপর রোজ ইশকুল কাটতে লাগলুম, সিগ্রেট বিড়ি ফুঁকতে লাগলুম আর সিনেমা দেখা আরোম্ভো কোরলুম। (হেবি মজা সার বেশ যাচ্ছিল) এমোন সময় হঠাৎ বাবার—স্টোক না কী হয়—সেই হল। বাবা মোল দু'দিনে। মা কাঁদলেন। মা'র কান্না দেখে কেনো জানি না আমার সার হাসি পেয়েছিল।

শ্রাদ্ধের পর মা বোললেন, 'বাবা, সারু, (আমার সর্ট নাম) তুমি কোনো কাজের চেষ্টা করতে থাকো, জমানো টাকায় আর ক'দিন চোলবে?'

আমি বললুম, 'মা, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি কিছুদিনের মধ্যেই কাজ খুঁজে নেব।' এর মধ্যে আবার সার ভাগ বসাতে কাকু, মামুরা সব চোলে এল। আমি তখনি বুঝেছি যে সব বেটা পয়সার লোভে এসেছে। মাকে সব খুলে বোললুম, মা কি শুনতে চায়, খালি বলে, 'বাবা, সারু, ছিঃ গুরুজনদের নামে এসব বোলতে নেই। তারা তোমার জন্যই এসেছেন।' এখন বুঝছি সার; (সব বদমায়েসের ধাড়ি মাকে ফোর-টুয়েন্টি দিইছিল,) মা-টাও ভারি বোকা ছিল, বুঝতে পারেনি। তাই কদিনের মধ্যেই সার, মায়ের অসুখ হল। আমি রোজ কাজ করবার নাম কোরে টাকা নিয়ে বেরুই; মাতো আসে তারপর দু'জনে জুয়ার আড্ডায় যাই। খেলি। বেশি দিনই হারি, কোনোদিন অল্প জিতি। মাতো আবার শেয়ার নেয়। বলে, 'ইয়ার কী জিনিস মাইরি, অ্যাঁ? পুরো সত্যি নেশা ধরিয়ে দেয়।—বল না, হ্যাঁ?—' আমিও পান খাওয়া দাঁত বার করে (এক্সটা দাঁত দুটোও) বলি, 'মাইরি, যা বলেছিস।'

বাড়ি ফিরে রোজই দেখি কাকারা—মামারা—সব হতভাগারা মনের আনন্দে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। মায়ের ঘরে গিয়ে দেখি মা একেবারে বিছানায় মিশে গেছে। আমায় দেখে বোলল, 'সারু, কাজ পেলি?'—আমি বলি, 'ক'দিনেই হোয়ে যাবে মা। তুমি শুধু একটু অপেক্ষা করো।'—'ভগবানকে ডাকিস, বাবা।'—আমি বোলতাম, 'মা, কাকারা-মামারা সব পাখার হাওয়া খাচ্ছে। দেখো গিয়ে ও-ঘরে।'—'ছিঃ', মা জিব কেটে বলত, 'ওসব কোনো কথা বোলো না বাবা, ওরা গুরুজন, (গুরুজন না, খাঁটি 'গরুজন') তোমার ভালো করবেন। তোমায় দেখবেন (তা তো দেখতেই পাচ্ছি।) সব সময়।'

আমি চুপ মেরে থাকতাম।

সেদিনের কথা কী বলব সার, আজও ভুলতে পারিনি। মাতোর সঙ্গে রেসের মাঠে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি মা-র বিছানার চারধারে সব মামা-কাকারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে বলল এক কাকু, 'সারু আয় এখানে। তোর মার অবোস্থা ভালো নয় (কাকু তোমার দরোদ উথলে পড়ছে—মাইরি।) তোকে দেখতে চাইছেন।'—আমি এগিয়ে গেলুম। মা তখনো ধুঁকছে। আমায় ডেকে বলল, 'বাবা সারু, আমার সময় হয়ে এল বাবা। ভালো হোয়ে থেকো। তোমার মামারা-কাকারা রইলো, তারাই (ওরা মা'র বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিল কেন, জানেন সার? হাওয়া বন্দো করার জোন্য। যাতে আমার মা-টা তাড়াতাড়ি মারা যায়) তোমায় দেখবেন।'—আমি কেঁদে ফেললুম, বললুম, 'মা, অমোন কথা তুমি (ভাবতে এখনোও আশ্চর্য লাগে সত্যি, এতগুলো চোখের জলের ফোঁটা তৈরি হল কী করে অত তাড়াতাড়ি?) বোলো না।'—মা চোখ বুঁজে তার হাত দিয়ে আমার হাতটা (মা-র হাত যে এত হাল্কা হয়ে গেছে তা জানতুম না) ধোরলেন। তারপর সেটা ছোট কাকুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বোললেন, 'ঠাকুরপো, ওকে দেখো। তোমরা, আত্মীয়রা ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আমি চোললুম, যম আমায় নিতে

এসেছে।' আমি কাকুর হাত ছাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মা-র উপর। চিৎকার করে উঠলুম, 'মা—আমায় ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না,—আমি তোমায় যেতে দেব না।' আমি অঝোর ধারায় কেঁদে চোললুম। ন'মামু আমার মাথার হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'সারু, ওঠ,—ভেঙে পোড়লে চোলবে না—' আমি সজোল চোখে মামুর দিকে তাকালুম, বললুম, 'মামু—এ কী হলো আমার?' মামুর বুকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম। মামু আমাকে বুকে টেনে নিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাঁদিসনে বাবা, সারু, কাঁদিসনে।' আমি মুখ তুলতে পারলাম না মামুর (সকলের চেয়ে ভালো?) বুক থেকে।

মায়ের সব কাজ হয়ে যাবার পর বাড়ির বাইরের ঘরে বোসে আছি হঠাৎ শুনতে পেলুম—ছোট মামু বোলছে, 'দাদা, তোমরা যদি এভাবে একটা বাচ্চাকে ঠকাতে চাও তা আমি চুপ করে সহ্যো করব না। তোমাদের এতটুকু লজ্জা করে না?'—আমি বুঝলুম না কী বেপার। পরে বুঝেছিলুম অন্য সবাই কি ধানধায় ছিল; (সব শয়তানরা শানশা পারটি!) সে কথা পরে বলছি সার।

একদিন দেখি ছোট মামু এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'সারু, আমি চোলে যাচ্ছি। তোকে রক্ষা করতে পারলুম না। ওরা তোকে ডোবাবে। আমি একা কী কোরতে পারি? আমার তেমন অধিকার নেই। আমি চোললুম।' চোখের জল মুছে মামু বিদায় নিলেন। আমিও কিছুক্ষণ কেঁদেছিলুম তা বেশ মোনে আছে।

কোয়েক বছরের মধ্যেই দেখি আমাকে দিয়ে মামা-কাকারা (মনের আনন্দে?) প্রায় চাকরের কাজ করাচ্ছে, নিজেরা দিব্বি আছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে আর গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরছে, (যেন নবাবের চাল। ছোত্রিশ রকোম জামা পোরে চল্লিশ রকোম মজা লুটছে।) সাহেবের মতো আছে। আমি কিছু চাইতে গেলেই ধমোক খাই।

মাতো কিন্তু রোজ বিকেলে আসতো। সোজা এসে আমায়

নিয়ে যেত জুয়া খেলার ওখেনে। এখন তো পয়সা বেশি পেতুম না। তাই বেশি খেলতেও পারতুম না (জোঁকগুলো শালা নুন দিলেও মরে না।) মোনে দুঃখ হোত। (এমনই অবস্থা হোয়েছিল আমার, সোত্যি বলছি) মাতো বোলতো, 'দাত্তু, আজকাল বোধহয় তোর ফুলকির বাজার ফিকে হোয়ে গেছে, (ফুলকি মানে যে পয়সা তা মাতোই শিখিয়েছিল) কী হোল বল ঠিক ঠিক।' মাতো আমার এসব ঘটনা জানত না, তাই ওকে সব খুলে বোললুম অ্যাদ্দিন পর। ও আমার চেয়ে বেশি বুঝতো, বোলল—'তোর কাকারা মামারা শয়তানেরা তোকে ফাঁকি দিয়েছে, দাত্তু। তোকে ওরা পালা করে আঁঠি চোষাবে আর নিজেরা আম খাবে। (আমিও চোষনেওয়ালা পারটি আছি কিনা?) তোকে বোকা বানিয়েছে।' শুনে আমার এইসান রাগ হল যে সটান বাড়ি চোলে গেলুম। বড় কাকাকে গিয়ে বোললুম, 'কাকা, আমার সম্পত্তির ভাগ আমাকে দিয়ে দাও।' কাকা বোললে, 'এসব কতা তোকে কে বোললে (লজ্জাবতী লতা! মরি আর কি) যে তুই তোর ভাগ চাইছিস?'—আমিও রেগে গেলুম, বললুম, 'যেই বোলুক, তাতে তোমার কী? আমি আমার ভাগ বুঝে নিতে চাই।'—'ঠিক আছে কাল বিকেলে আসিস তখন বলব।' আমি বললুম, 'বেশিক্ষণ ঘোরালে আমার বন্ধু মাতোকে নিয়ে আসবো, ও আদায় করে ছাড়বে—ও ছুরি চালায়—অনেকের পেট ফাঁসিয়েছে (তোমারও হবে—ফিকির খুঁজলে) এসব ওর কাছে কিছুই না।'—কাকু একটু ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হল। কিন্তু আমি জানতাম না কাকুর মনে কী ছিল?

পরের দিন বিকেলে গেছি। কাকু একটা সাদা রঙের কী কাগজ দেখালে, বোললে, 'তোর বাবা সব আমাদের দিয়ে গেছে। তোকে আমরা দয়া করে রেখেছি, তুই আজই চোলে যা। বেশি গন্ডগোল কোরলে থানায় ধরে নিয়ে যাব।'

বুঝলাম নেহাত মিথ্যে নয়। আমার কিছুই করার নেই। ওরা সব্বাই আমার এগেনস্ট লোক। যাইহোক, বিকেলে মাতোকে

গিয়ে সব বললুম। ও বোলল, 'দাত্তু, কোনোও উপায় নেই, মাইরি। থাকলে এই মাতো শর্মা তাদেরকে ছেড়ে কথা কইতো না। তবে একটা কথা শোন, চোলেই যখন আসবি তাহোলে আজ রাত্রেই কিছু হাতিয়ে নিয়ে বেরো না কোথা। আমারও পেছুটান নেই, তোর তো নেই-ই, কী (মন্দ নয়—সক্কালবেলা উঠে ব্যাপার দেখে মামা-কাকাদের ফর্মাগুলো কী হবে ভেবে দারুণ হাসি পেল) বলিস?'—এক কথায় রাজি হোয়ে চোলে এলুম। ভাবলুম কিছুই যখন দেবে না, তখন যা পাই তাই হাতিয়ে নিই না কেন? শেষে তাই ঠিক কোরলুম। যা আসে তাই লাভ (ওরা যদি আমায় কলা দেখাতে পারে আমিই বা খেতে পারব না কেন? বলুন না সার!) ভেবে মনে মনে প্রস্তুত হোলাম।

সে রাতে খুঁজে পেতে কাকার ক্যাশ (কাকার না, হাতি—আসোলে তো বাবার) ভেঙে হাজার ছয়েক টাকা হাতিয়ে পালালুম মাতোর বাড়ি। সে তখনো জেগেছিল। আমায় দেখে এগিয়ে এল, বোললো, 'দাত্তু ওস্তাদের খবোর কী?' আমি একটু হেসে (এক্সট্রা দাঁত দুটোও হাসল) বললুম, 'মাতো, ওস্তাদের উত্থান হয়ে গেছে, এই দ্যাখ,' বলে আমি টাকার বান্ডিলটা বার কোরলুম। মাতো আনন্দে পাগলের মতো হয়ে গেল। বার বার টাকাটার ওপর হাত বুলোতে লাগল, বোললো, 'দাত্তু, চ আমরা পালাই। আর দেরি কোরে লাভ নেই,'—'চ' আমিও সায় দিলুম। সে রাতেই সার, আমি আর মাতো পালালুম। তারপর দু-তিন বছর কেটে গেল...

আমি আর মাতো এখোন বোস্তিতে থাকি। দুজনেই সার, পকেটমার। আমরা একসঙ্গে হেঁটে কাছে এলেই চেনা লোকেরা ভয় খায়। বলে, 'বাবারা, আজ আর কিছু গ্যাঁড়াস না। আজ পকেটে তেমন কিছু নেই। আমরা হাসি (আমার সার মাঝে মাঝে কান্না পায় মা-র কথা ভেবে) আর বোলি, 'আজ আর নেওয়ার মুড নেই (কেমন ইংজিরি বললুম, বলুন তো সার?

মাতোই শিখিয়েছিল)।'

মাঝে মাঝে সার ঘেন্না ধরে এ লাইপ-এর উপর (মন্দ নয়, না?) ভাবি লাভ কিছুই হল না এভাবে পাল্যে এসে। যাই হোক, এমোন সময়ই ঘটল সেই আশ্চর্যো ঘটনা। এবার সার সেই কথাই বলি।

একদিন মাতো এসে বোলল, 'দাত্তু, চ অনাথ আশ্রমে যাই, সেখেন থেকে অনেক বড়লোকে ছেলে পালটে নেয়, একবার লাক টেরাই কোরে (এক্কেবারে জুয়ার মতন।) আসি।'—'চ' আমিও আর আপত্তি কোরলুম না। গেলুম সেখেনে। মাতো যাবার পথে মোনে করিয়ে দিল, যদি তোকে নেয়, আমায় দেখিস (আর যদি তোকে নেয় মাতো?) বুঝলি। আমাকে নেলে তো নিশ্চিন্দি হোয়েই গেল।'

সত্যি সার, মাতোকেই নিলেন এক ভদ্রলোক। (মাতোর চেহারাটা মন্দ নয়) তারও বাড়ি-গাড়ি (আমার বাবার মতো।) আছে। মাতো ভালো জামা-জুতো (মাতো আমার থেকে ভালো জুয়া খেলত) পরলো। তারপর হঠাৎ ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে সে কী হাউ হাউ করে কান্না (মেয়েছেলে নাকি?) কী বোলবো? আমিও ওকে বুকে চেপে ধোরলুম, ফিসফিস করে (ঘুম পাড়ানোর মতো?) ওর কানে কানে বোললুম, 'মাতো, আমি এখোন কী করব তুই আমায় বোলেদে।' মাতো আরও জোরে কেঁদে উঠল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিলুম। ওর বাবা-মা (নকল) দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে।

মাতো চোলে গেল। (যেমন ভাবে এসেছিল—তেমনি নাকি?) আমি এবার একা পোড়ে গেলুম। হাঁটতে হাঁটতে বোস্তির দিকে এগ্যে চোললুম। পাড়ার লোক জিজ্ঞেস কোরল ঃ 'দাত্তু, কী ব্যাপার, মাতো কোথায়?' একটা হাতের চেটোকে আমার মাথার উপরে ধোরে দেখালুম। ওরা হাঁ করে তাক্যে রইলো। (আমি যেমন চেয়েছিলুম কাকা-মামাদের দিকে) আমার দিকে। আমি

পাশ কাট্যে বেরিয়ে গেলুম।

সার, মানুষ সহজে মোরতে পারে না তাই আমি বেঁচে রইলুম অমোগ নিয়োতির মতো। অনেক বছর পার হয়ে গেল। (মাতোও বেঁচে ছিল) লোকের মুখে শুনলাম মাতোর সেই বাবা-মা (মানে কিনা নকল) কী ভাবে জানি মারা গেছে। (সত্যি, আমি জানি মাতোই ওদের সিঁড়ি দেখিয়েছে) এখন সার চেয়ে-চিন্তে খাই—ভিক্কে কোরি আর কি। (বিশ্বাস হোচ্ছে না?) একদিন ভাবলুম মাতোর সঙ্গে দেখা করে আসি। সেদিন সোন্দে সাতটা।

মাতো লাইবিরি ঘরে বোসেছিল। (মাতো ব্যাটা লেখাপড়া শিখেছে।) আমি আমার সেই সহসরো দুয়ারি পোশাক পোরে ঢুকলাম ওর ঘরে। (পাঁচিল ডিঙিয়ে)। মাতো আমায় দেখে চমকে উঠল। বোলল, 'সারস্বত, তুই (দাত্তু নাম ভুলে গেলে 'গুরু'? হ্যাঁ আমি সেই দাত্তু সরখেল বেরাদর জান!) এখেনে! কী চাই?'—বললুম, 'মাতো, আমি এখোন ভিক্কে কোরছি, আমায় কিছু সাহায্যো কর, আর নাই কোরিস—নীচে যে-কোনো জায়গায় একটু থাকতে দে।'—'তা, হয় না, সারস্বত—এখানে প্রেসটিজের কোশ্চেন (কি জিনিস বাবা, আট নম্বরী নাকি?) আছে। লোকে কী বোলবে। তবে তুই আমার চেনা লোক (বন্ধু বোলতে আটকে যাচ্ছে নাকি?) যোদি টাকা চাস দিতে পারি,' বলতে বলতে ও একটা দশ টাকার নোট (পুরোহিতের দক্ষিণে আর কি!) আমার দিকে এগ্যে দিলো। ভাবলুম নোটটা ছিড়ে ফেলে দিই। তারপর বলি, আমার দু'হাজার টাকা ফিরিয়ে দিতে। আবার ভাবলুম, যা পাই তাই লাভ (ঠিক আগের মতো।) তাই নোটটা নিলুম। বোললুম, 'মাতো, মাঝে মাঝে তোর এই গরিব বন্ধুকে সাহায্যো করিস।' বোলতে বোলতে একটু চোখের জল বার কোরে দিলুম (অপূর্ব কায়দা!), ওর পা চেপে ধোরলুম। ও তাড়াতাড়ি সোরে গেল। আমি চোলে গেলুম। আমার চোখে-মুখে তখোন জিঘাংসার চিহ্ন।

এবার একটা সুন্দর বুদ্ধি মাথায় এল। রাস্তায় যা পাই তাই কুড়োই। আর প্রতি সপ্তায় মাতোর বাড়ি (ম্যানশন?) যাই। (দারোয়ানগুলো এখন আটকায় না।—মাতো 'পরোপকারী' গরিবকে সাহায্য করে।) একদিন দেখি মাতোর সব সুট-বুট পরা বন্ধু এসেছে। সব মদ খেয়ে পড়ে আছে। একটা কোট চুরি কোরলুম (সামান্য জিনিস।) আর-এক জোড়া বুট, (আরও সামান্য?) টাকা না নিয়ে চোলে এলুম।

তারপর এল সেই দিন। মাতো বোসেছিল সেই লাইব্রেরি ঘরে। আমি গেলুম। পেছন থেকে মাথায় এক বাড়ি মেরে, মেরে ফেললুম। (কেউ ঢুকতে দেখেনি।) তারপর আমার সব কাজ শুরু হোল। সে অনেক কাজ। সব সেরে দু-ঘণ্টা পর রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। কেউ জানল না। আমি জানতুম কেউ কিছু কোরতে পারবে না। (আপনিও না,—সার) কেন? তবে শুনুন সার।

ঘরে পাবেন একটি কোট, (সেই চোট করা মাল) সিগ্রেটের ছাই—আসোলে বিড়ির, ক্রাচের দাগ—আসলে ছোট ছোট দুটো লাঠির, আর একটা কি দুটো জুতোর ছাপ—নিশ্চয়ই—হ্যাঁ গ্যাঁড়ানো জিনিস)। পাখাটা চালের নীচে ঘুরছে। (যদিও শীত পড়েছে)।

কোট-টোট সব দেখে আপনি বলবেন হত্তাকারী নেটা। কেননা ব্যবহায্যো জিনিস সব কোটের বাঁ পকেটে পাওয়া গিয়েছে। কী কী, লেখবার পেন্সিল (কুড়িয়ে পাওয়া) বাসের টিকেট (বলা বাহুল্য একই), রুমাল (মাতোরটাই—অবশ্য আপনি বুঝতে পারবেন না কোনো কিছু লেখা নেই) পয়সা (ভিক্কের) এক প্যাকেট সিগ্রেট—চারমিনার (সদ্য কেনা, দুটো রাস্তায় ফেলে দিয়েছি—লাইপে চারমিনার খাইনি)—আর নস্যি (কৌটোটা পুরোনো—নস্যিটা কেনা) আর কোটটা—ওটা অনেক বড় (আমার বাবার সাইজের)। লাঠি দুটো আর পাবেন না (পোড়ানো হয়ে গেচে)। জুতো জোড়া গঙ্গার জলে।

পাখা চোলছে দেখে আর কোটটা চেয়েরের গায়ে পরানো দেখে আপনি বোলবেন হত্তাকারী হাওয়া খাচ্ছিল উত্তেজনা কমানোর জন্য। (সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি)। কপালের ডান দিকে চোট দেখে বোলবেন যে হত্তাকারী যে নেটা তার আরও প্রমাণ। (আপনার প্রশংসা কোরবে সক্কলে, না?) তারপর আপনি গোলক ধাঁধায় ঘুরবেন। (চিরকালের জন্য?)। আমাকে আর এখোন পাবেন না। অন্য জায়গায় চোলে যাচ্ছি। কাকা-মামাগুলো বেঁচে আছে কিনা (থাকবে না আবার?) খোঁজ নেব। আশাকরি কুশল আছেন। কামোনা করুন যেন আর কেউ না আমার মতো হয়। আবার একবার চোখে জল আসছে সার, মায়ের জোন্য। (আমার জোন্য অনেক কোরেছিল)

—ইতি—

আশীরবাদ প্রারথী,

সারস্বত।

অনীশ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। কিছুই চোখে পরিষ্কার দেখতে পেলেন না। এই শীতেও যে বর্ষার ঢল নেমেছে চারিদিকে। সব কিছু ঝাপসা লাগছে কেন? এর উত্তর খুঁজে পেলেন না অনীশ চৌধুরী।*

* *কাহিনী সম্পূর্ণরূপে লেখকের কল্পনাপ্রসূত।*



নীল গোলাপ

গোলটেবিলকে ঘিরে বসেছিল কয়েকজন। টেবিলের উপর একটা বড় রকম মোমবাতি জ্বলছে। তার আলোয় চেয়ারে উপবিষ্ট চারজনেরই মুখ অংশত দৃষ্ট হচ্ছিল। ছায়াগুলো মুখের উপর পিছলে যাচ্ছিল। চারজনই উসখুস করছিলেন কিছু একটা বলার জন্য, কিন্তু সকলেই চাইছিলেন যে অন্য কেউ শুরু করুক।

এই আলো-আঁধারির মধ্যে প্রবেশ করলেন একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি। তার দেহের আউটলাইনটা পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি দরজার গায়ে হাত রেখে দাঁড়ালেন; মাথাটা হেলিয়ে হাসলেন, তারপর এসে তিনি টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন।

উপবিষ্ট চারজনের মধ্যে একজন মোমবাতিটা আগন্তুকের মুখের

কাছে তুলে ধরলেন, তারপরই তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল, 'একী— তুমি?'

আগন্তুকের মুখটা এবার পরিষ্কার দেখা গেল। চোখে গগলস, মার্কারি দেওয়া—তবে কালারটা খুব লাইট। একজোড়া সূচলো গোঁফ। মুখে কাঠিন্য। ঠোঁটে পাইপ ধরিয়ে তিনি জ্বালালেন, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

—'বোস।'

—'হু' বলে বসলেন তিনি। ইতিমধ্যে মোমবাতিটা পুনরায় টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন একজন নারীমূর্তি। আগন্তুক মুখ খুললেন, 'মোতি, কী ব্যাপার? কোনো সমস্যা নাকি?'

উত্তর দিলেন মোতি চৌধুরী নয়, আনন্দ সান্যাল, 'একরকম তাই বলতে পারো, অনীশ। একটা সমস্যা যার কোনো উত্তর এখনও আমরা খুঁজে পাইনি।'

—'বলতে আপত্তি নেই তো, আনন্দ?' প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী।

—'না, না, আপত্তি কীসের?' তারপর মোতি চৌধুরীর দিকে ফিরে বললেন, 'মিসেস চৌধুরী, আপনিই বলুন।'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করলেন মোতি চৌধুরী, 'আগে এখানে উপবিষ্ট বাকি দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ের পালা শেষ হোক তোমার, ইনি শ্রীসুহৃদ মল্লিক—এনারই স্ত্রী সুজাতা মল্লিক মারা গেছেন বিচিত্রভাবে। আর ইনি ডাক্তার অমরেশ রুদ্র—ইনিই শ্রীমতি সুজাতা মল্লিকের দেখাশোনা করেছিলেন। আর মিঃ মল্লিক, মিঃ রুদ্র—ইনি হলেন অনীশ চৌধুরী, সত্যান্বেষী অনীশ চৌধুরী—আমার স্বামী—।

'এবার ঘটনার শুরু থেকে শুরু করা যাক।—সুহৃদ মল্লিক বিয়ে করেছিলেন সুজাতা মল্লিককে, প্রায় চার বছর আগে। তাদের বিবাহিত জীবন মোটামুটি সুখেরই ছিল। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরেই সুজাতা মল্লিক একটু বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েন। তখন বিপদে পড়লেন সুহৃদ মল্লিক। তিনি স্ত্রীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ডাঃ রুদ্রকে তিনি ডেকে পাঠালেন তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। ডাঃ রুদ্র দেখে বললেন যে, এটা কিছু বিপদের লক্ষণ নয়। শুধু-শুধুই মিসেস মল্লিক নার্ভাস হয়ে পড়ছেন।

তাই তিনি মিসেস মল্লিককে স্মেলিং সল্ট ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন তারপর থেকে মিসেস মল্লিক মোটামুটি সুস্থই ছিলেন।

'এরপর একদিন মিঃ মল্লিকের বাড়ি এলেন মিস অর্চনা মল্লিক—তা দিদিকে দেখতে—বলা বাহুল্য। ডাঃ রুদ্রকে দিদির অবস্থার কথা জিজ্ঞাস করলেন—তারপর কিছুক্ষণ দিদির কাছে থেকে, চলে গেলেন বিকেলে

'এইভাবে দিন যায়; মিস অর্চনা মল্লিকের আসার বিরতি—সম অসময় কিছুই নেই। তার জামাইবাবুর শোচনীয় অবস্থা তখন। এব একা থাকেন, কিছুই ভালো লাগে না। তাই মিস মল্লিক রয়ে গেলেন— তার জামাইবাবুর অবস্থা দেখে তার করুণা হয়েছিল। তিনি তা জামাইবাবুর সঙ্গে ঘোরেন ফেরেন, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য চে করেন। ডাঃ রুদ্র ইতিমধ্যে অর্চনা দেবীর দিকে ঝুঁকেছেন। তার বাচাল বেড়ে গেল। এখানে ওখানে ঘুরঘুর করেন, মিসেস মল্লিকের সঙ্গে ক বলার সুযোগ খোঁজেন। এইভাবে চলতে লাগল।

'এমন সময় শ্রীমতি মল্লিকের অবস্থা আরও চরমে উঠল। তা শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। এমন হল যে মিঃ মল্লিক স্ত্রীর দিকে ফি চাইতে পারেন না, তার দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি আর সহ্য করতে পারতে না। তখন ডাঃ রুদ্র পরামর্শ দিলেন বাড়ি বদলে একটা আলো-বাতাসপূ বাড়ি নেবার জন্য।

'তখন মিঃ মল্লিক শহরতলীতে একটা পুরোনো বাড়ি কিনে ফেললেন। ঘর-দরগুলো খুব ভালো ভাবেই সাজানো ছিল। সেই বাড়িতে গুছিয়ে বসতে তাদের বেশি সময় লাগল না।

'এরই মধ্যে ডাঃ রুদ্র, মিঃ মল্লিককে একজন নার্সের প্রয়োজনীয় জানালেন। মিঃ মল্লিক অনুমতি দিলে পর ডাঃ রুদ্র একজন অ্যাংলে ইন্ডিয়ান নার্স নিয়ে এলেন, তার নাম এলিজাবেথ। সে এসেই বাড়ি সকলের মন কেড়ে নিল। তার কাজ কর্মে সকলেই খুশি।

'মাঝে একদিন ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস মল্লিক। সব দৌড়ে এল, রাত তখন সাড়ে দশটা। তখন ভয়ে মিসেসের মুখ সা হয়ে গেছে। তিনি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়েছিলেন জানালাটার দিকে।

'সুজাতা মল্লিকের জন্য সব থেকে খোলামেলা ঘরটাই বেছে দেও

হয়েছিল। জানালাটা ছিল রাস্তার দিকে। সবাই ছুটে গেল জানালার দিকে। ডাঃ রুদ্র হাত বাড়িয়ে একটা সাদা কাগজ বার করে আনলেন বাইরে থেকে। ব্যাপারটা ভালো পরিষ্কার হল না।

'এই ব্যাপারের পর নার্স এলিজাবেথ বাজার থেকে এক রাশ কাগজের ফুল কিনে এনে মিসেসের ঘরের দেওয়াল সাজাতে শুরু করল। গোলাপ, পদ্ম, ডালিয়া ইত্যাদি ফুলে ঘরের দেওয়াল সাজানো হল, দেওয়ালে ফুলগুলো আঠা দিয়ে আটকিয়ে। এরপর কয়েকদিন মিসেস বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। স্মেলিং সল্টের শিশি খুব একটা দরকার হতো না।

'কয়েকদিন পরে মিস্টার মল্লিক লক্ষ করলেন যে সুজাতা দেবী একগাদা জ্যোতিষবিদ্যার বই কাকে দিয়ে আনিয়ে পড়ছেন। তিনি বারণ করলেও মিসেস শুনলেন না। ওই বইগুলো পড়তে থাকলেন। মিঃ মল্লিক সটান গেলেন এলিজাবেথের কাছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লিজা, ওই রাবিশ বইগুলো ওকে কে এনে দিল?'

—'আমি,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল এলিজাবেথ, 'আমার বারণ শুনলেন না।'

'এদিকে অর্চনা দেবী তার জামাইবাবুকে আগলাতে আগলাতে তার হৃদয়ে কিছুটা স্থান দিয়ে ফেলেছেন, তা জানতে পেরে ডাঃ রুদ্র হয়তো কিছু বলেও থাকবেন। যা হোক অর্চনা দেবী পড়লেন দোটানায়। জামাইবাবুর জন্য তার করুণাও হয় অথচ তা প্রকাশ করবার উপায় নেই ডাঃ রুদ্রর জন্য।

'একদিন ডাঃ রুদ্রর কাছে মিসেস মল্লিক জেদ ধরলেন এক জ্যোতিষীকে নিয়ে আসার জন্য। ডাঃ রুদ্র না পেরে এলিজাবেথকে বললেন। এলিজাবেথ বলল, তার এক জানাশোনা বান্ধবি আছে যে হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। মল্লিকের কাছে তাকে একদিন নিয়ে আসবে কথা দিল লিজা।

'একদিন সেই মেয়েটি এল। পরনে তার বিচিত্র বেশবাস। মুখের উপর বিচিত্র রঙের আঁকিবুকি। মিসেস মল্লিক তাকে তার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ভেতরে কীসব কথা চলতে লাগল কেউ তা

শুনতে পেল না। ডাঃ রুদ্র তখন লিজাকে কী কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলেন, তাই বাড়িতে তখন ছিল মিঃ মল্লিক, মিস মল্লিক ও ডাঃ রুদ্র।

'ঘণ্টাখানেক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে জ্যোতিষী চলে গেল। মিসেস মল্লিককে দেখার জন্য মিঃ মল্লিক ও মিঃ রুদ্র মিসেসের ঘরে ঢুকলেন। মিসেস সুজাতা মল্লিক তখন তাকিয়েছিলেন তার মাথার কাছে দেওয়ালের একটা লাল ডালিয়া ফুলের দিকে। (বলাবাহুল্য ফুলটা কাগজের।) তার হাতে স্মেলিং সল্টের শিশি।

'মিঃ মল্লিক গিয়ে ঝাঁকানি দিলেন তাকে, "সুজাতা, কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?" মিসেস ফিরে তাকালেন। চোখে আলুথালু দৃষ্টি। একটি হাতে একটা ছোট চিরকুট। সেটা তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে পড়লেন মিঃ মল্লিক। তাতে লেখা, "নীল ডালিয়া—তার আগমন; নীল পদ্ম মানে সাবধান বাণী—আর নীল গোলাপ মানে মৃত্যু—তোমার মৃত্যু।" ডাঃ রুদ্রও পড়লেন, কিছুই বুঝলেন না।

'পরদিন ভোরে সুজাতা মল্লিকের আর্ত চিৎকারে সকলে দৌড়ে গেল। দরজা ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলল লিজা। সকলে ঘরে ঢুকলেন, সকলেই দেখলেন মিসেসের মাথার কাছের দেওয়ালের ডালিয়া ফুলটা নীল হয়ে গিয়েছে—একেবারে নীল। আর মিসেস ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকছেন।

'মিসেস সুজাতা মল্লিক বার বার অনুরোধ করলেন মিঃ মল্লিককে, (কিন্তু তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটা) বাড়ি পাল্টাতে। যা হোক শেষে লিজা খাটটাকে স্থানচ্যুত করে অন্য দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেল। সুজাতা মল্লিক তখন ঘুমে ঢলে পড়েছেন।

'পরদিন ভোরে মিসেসের আর্তনাদ পুনরায় শোনা গেল। এবং ঘরে ঢুকে প্রত্যেকেই দেখলেন একটা নীল পদ্ম মিসেসের মাথার কাছে। মিসেস তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। এবার অর্চনা দেবী অনুরোধ করলেন মিঃ মল্লিককে বাড়িটা পাল্টাতে। কিন্তু মিঃ মল্লিক এবারও হেসে উড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

'কিন্তু পরদিন চরম হল। মারা গেলেন মিসেস সুজাতা মল্লিক। ডাঃ রুদ্র বডি দেখলেন, হার্টফেল। মৃতদেহ পোড়ানো হয়ে গেল। আর

মিসেসের ঘরে দেখা গেল সেই নীল গোলাপ। মিসেসের মাথার কাছে, দেওয়ালে।

'এখানেই সব শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না। মিস মল্লিক আমাকে এসে বললেন যে দিদির ঘরে ঢোকবার পর একটা কীরকম যেন গন্ধ তিনি পেয়েছিলেন। এবং তার আরও ধারণা যে, হার পুওর সিস্টার ওয়াজ ব্রুটালি মার্ডারড।' এইখানে থামলেন মোতি চৌধুরী।

'কথাটা ঠিকই।' শুরু করলেন অনীশ চৌধুরী, 'আচ্ছা, মোতি, মিঃ মল্লিক কি অর্চনা দেবীকে বিয়ে করেছেন?'

—'হ্যাঁ' জবাব দিলেন সুহৃদ মল্লিক, 'আমি ওকে বিয়ে করেছি প্রায় আটমাস হল। কিন্তু আমাদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়। ওর সন্দেহ আমি ওকে পাবার জন্য তার দিদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছি।'

—'না, তা নয় ব্যাপারটা,' অনীশ চৌধুরী কাশলেন, 'আসলে কী জানেন খুনটা করেছেন ডাঃ রুদ্র আর খুনের জমি তৈরি করেছে লিজা,—তবে ডাঃ রুদ্ররই নির্দেশে।'

আনন্দ সান্যাল রিভলভার বের করলেন, ডাঃ রুদ্রর দিকে উঁচিয়ে ধরলেন, তারপর তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

'ব্যাপারটা মোটামুটি একটা বৈজ্ঞানিক ধাঁধা।' অনীশ চৌধুরী শুরু করলেন, 'প্রথমে ডাঃ রুদ্র লিজাকে দিয়ে কতকগুলো ডালিয়া, পদ্ম আর গোলাপ ফুল কেনালেন। ফুলগুলো কাগজের—তবে সাধারণ কাগজের নয়, লিটমাস—লাল লিটমাস কাগজের। সেগুলো তিন দেওয়ালে আটকানো হল। তারপর কোনো রকমে মিসেসকে ভয় দেখানো হল। প্রথমে একটা সাদা কাগজের সাহায্যে, পরে লিজাকে জ্যোতিষী সাজিয়ে। লিজাই মিসেসকে জ্যোতিষ বিদ্যার বইগুলো পড়িয়েছিল জ্যোতিষ সম্বন্ধে তার মনে ভয় জন্মানোর জন্য। তাতে সে সফলও হল। পরে সে জ্যোতিষী সেজে এল এবং ডাঃ রুদ্রর নির্দেশমতো চিঠিটা দিয়ে চলে গেল। সে যদি ধরা পড়ত, বলত, "ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়।" যাহোক এবার গ্যাঁড়াকলের ব্যাপারে আসি। আমরা জানি স্মেলিং সল্ট হল অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, এটা একটা ক্ষার। তাই যদি কোনো লাল লিটমাস পেপার এই ক্ষারের সংস্পর্শে আসে তবে তা নীল হবেই।

সুজাতা মল্লিক সব সময়ই স্মেলিং সল্ট শুঁকতেন। অ্যামোনিয়াম বাতাসে বাতাসে দেওয়ালের ফুলে গিয়ে লাগত তাতেই ফুলটা নীল হতো। মানে একটা করে মাত্র তিনটেই বিশেষ ফুলই ছিল তিন দেওয়ালো, যেগুলো লিটমাস পেপারে তৈরি ছিল। প্রথম যেখানে খাট ছিল সে দেওয়ালে মাথার কাছে লাল লিটমাস পেপারের একটাই ডালিয়া ফুল ছিল। দ্বিতীয়বার অন্য দেওয়ালে ওই কাগজের একটাই পদ্ম ফুল ছিল মাথার কাছে। পরের বার গোলাপ ছিল।

'এবার মিসেসের মৃত্যুতে আসি, ডাঃ রুদ্র স্মেলিং সল্টের শিশি থেকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ফেলে দিলেন। তার বদলে পটাশিয়াম সায়নাইড আর জলের মিকশ্চার ভরে রাখলেন। মিসেস ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকতেন। এটাতে দু-এক টান দিতেই মারা গেলেন।' অনীশ চৌধুরী আবার পাইপ ধরালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'ডাঃ রুদ্র চেয়েছিলেন অর্চনা মল্লিককে। কিন্তু অর্চনা দেবী মিঃ মল্লিককে ভালো বেসেছিলেন। পরে তাকে বিয়েও পর্যন্ত করেছেন। তাদের বিয়ে যাতে সুখের না হয় এই জন্য ডাঃ রুদ্র এই বিশ্রী খুনটা করে তার দোষ আর সন্দেহ মিঃ মল্লিকের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেন। মানুষের সাইকোলজি আর খুনের পদ্ধতি সহজেই ডাঃ রুদ্রকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাই না?'

মোমবাতিটা গলে গলে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এতক্ষণে।*

* *বিদেশী ছায়ায়।*



খুনের ধাঁধা

চন্দন দেবনাথ হাতের তাস নিয়ে ভাবছিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'তাস দেখাও' বলবেন কিনা। হঠাৎ কাঁধে টোকা খেয়ে চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। মৃদু হাসি নিয়ে যে ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি অনীশ চৌধুরী। ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বললেন অনীশ চৌধুরীকে। তারপর বললেন, 'যশোবন্ত, নাউ শো ইওর কার্ডস!

মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হেসে হাতের কার্ড পাতল যশোবন্ত। ইতিমধ্যে চন্দন দেবনাথ ডাবল স্টেক টেবিলে রেখেছেন। দেখা গেল একটা গোলাম, একটা দশ আর একটা বিবি।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে চিৎকার করে হাতের তাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে সব টাকা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চন্দন দেবনাথ।

বললেন, 'অনীশদা, চলুন—'

যশোবন্তের করুণ মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নাইট ক্লাবের বাইরে পা দিলেন দুজনে।

'অনীশদা, জরুরি কিছু মনে হচ্ছে?' হাঁটতে হাঁটতে বললেন চন্দন দেবনাথ।

অনীশ চৌধুরী বললেন, 'একজন লোক একটা কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চায়—একটু নিচু লাইনের কাজ—মানে একজনকে খুন করতে হবে। আমার দ্বারা তো আর সেটা সম্ভব নয়। তাই তোমাকে—'

'আপনার মক্কেল কই? প্রশ্ন করলেন দেবনাথ।

অদূরে দাঁড়ানো একটা লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন অনীশ চৌধুরী। বললেন, 'চন্দন, তুমি শুধু কাজটা হাতে নিয়ে খোঁজ নেবে এর পেছনে কী ব্যাপার আছে।'

পাশের গলি দিয়ে সরে পড়লেন অনীশ চৌধুরী। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'গুডবাই!'

হন হন করে এগিয়ে গেলেন চন্দন দেবনাথ। সানগ্লাশটা কী মনে করে খুলতে গিয়েও খুললেন না। পাজামার পকেটে রিভলভারটা অনুভব করলেন।

ভদ্রলোক একটা লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছিল না। এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন দেবনাথ। ভদ্রলোক অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও কোনো রকমে বললেন, 'মিঃ দেবনাথ—

'বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে,' বলে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন চন্দন। পুরো ক্রিমিনালদের মতো মুখ। মনে মনে হাসলেন ঃ 'ব্যাটা নিজে না পেরে আমার কাছে এসেছে।'

লোকটিকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে নিজে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, 'বলুন, কী করতে হবে?'

'একটা লোককে খুন করতে হবে,' ভদ্রলোকের শীতল কণ্ঠস্বর ঃ 'লোকটা আমাকে মারতে চায়। কিন্তু যেহেতু প্রিভেনশন ইজ বেটার

দ্যান কিওর, সেহেতু আমিই আগে ওকে সরাতে চাই।' একটু থেমে আবার বললেন, 'রিভলভার আছে?'

'আছে, কিন্তু আপনার নামটা?'

'সেটা জানাতে একটু অসুবিধা আছে। বোঝেনই তো আমাদের ব্যাপার—'

'ও, সরি।'

'এবার ব্যবসার কথা হোক, ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি এক হাজার টাকা পাবেন লোকটাকে খুন করবার জন্য।'

'যে রিভলভার দিয়ে গুলি করব, তাতে গুলি থাকবে না।' অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিলেন দেবনাথ।

'তবে—দু-হাজার। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন ভদ্রলোক।

'একটা গুলি নেব, তবে সেটা মিস ফায়ারও হতে পারে। নিরীহ কণ্ঠস্বর চন্দনের।

'তিন হাজার—'

'দুবার গুলি করব, তবে লোকটার লাগবে কিনা বলতে পারছি না—

'পাঁচ হাজার।' দাঁতে দাঁত পিষে বললেন ভদ্রলোক।

'লোকটা মরবে।'

এইবার দাঁত বার করে হায়নার হাসি হাসলেন ভদ্রলোক ঃ 'সত্যিই, এসব কাজে যে দর একটু বেশি, তা আমার জানা ছিল না—'

'তবে এবার জেনে নিন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন দেবনাথ।

ভদ্রলোক কিছুটা রুষ্ট হলেও মুখে কিছু বললেন না। এবার ভদ্রলোকের পাশে এসে বসলেন চন্দন। বললেন, 'স্যার, আপনার সত্যি-মিথ্যে যা হোক একটা নাম বলুন—আপনাকে ডাকব কী বলে?'

'যা হোক কিছু—যেমন নিউটন বর্মা—

'ভারি সুন্দর নাম তো।' বললেন দেবনাথ, 'তবে একটা কথা কি জানেন, আমি ঠিক পুরোপুরি প্রফেসনাল কিলার নই। তাই জানতে চাই যে ভিক্টিমকে কেন আপনি খুন করছেন, আর কেনই আপনি মৃত্যু-ভয়ের আশঙ্কা করছেন?'

'আপনাকে আমি সংক্ষেপে কিছুটা জানাতে পারি, নিউটন বর্মা বললেন, 'ভিক্টিমের নাম মণীশ আইচ। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে। পশ্চিমবঙ্গে আসে প্রায় বছর আট হবে। এই নিন তার ফটো। (হাত বাড়িয়ে ফটোটা নিলেন চন্দন দেবনাথ) ওর এক যমজ ভাই ছিল—মানে এখন আর নেই। তার নাম বাবু আইচ। মাসখানেক হল মারা গেছে সে। দু-ভাইয়ের মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য ছিল চেহারায়। শুধু বাবু আইচের কানের পেছনে বড় একটা তিল ছিল। আর সব এক রকম। আমার ব্যবসা আছে—আই মিন এ স্পেশাল টাইপ অফ বিজনেস। তার পার্টনার আমরা দুজন—মানে আমি আর মণীশ আইচ। প্রায় ছ'বছরের বিজনেস আমার—'

'বিজনেসটা কীসের?' বাঁ-হাত দিয়ে রিভলভারটা পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন চন্দন।

'বলতেই হবে?' একটু আমতা আমতা করলেন ভদ্রলোক।

'বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে?' রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন দেবনাথ।

'ছবি জাল করার বিজনেস। এবার হয়েছে?'

'তার মানে পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি নকল করার ব্যবসা?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'খুব ভালো ব্যবসা,' হাই তুললেন দেবনাথ। ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত একটা বেজে সাতাশ মিনিট। ভদ্রলোককে বললেন, 'আরম্ভ করুন, তারপর?'

ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আবার শুরু করলেন, 'মণীশ আইচের আঁকার হাত খুব ভালো। সে-ই ছবির নকলগুলো আঁকে, আর আমি খদ্দের ধরে সেই জিনিসগুলো গছিয়ে দিই। আপনি লাইনের লোক—আপনি বুঝবেন—চিটিংবাজির ব্যবসা আর কি।

'মণীশ আইচ প্রায়ই আসত রাত্তিরের দিকে। সারারাত ছবি নকল করত, ভোরের দিকে বাড়ি চলে যেত। আমার বাড়িটা—মানে যেখানে ছবি নকল করা হয়, সেটা শহরতলীতে একেবারে নির্জন জায়গায়। কাজের সুবিধা হয় আর কি। (ভদ্রলোক হাসলেন)

'একদিন রাত্রিবেলা। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। মণীশ এসে ঢুকল ঘরে...

ঘরে ঢুকলেন মণীশ আইচ। পরনে প্যান্ট-শার্ট। মাথার চুল আঁট করে আঁচড়ানো। ঘরে একটা সাধারণ অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। একটা চেয়ারে অলস ভঙ্গিতে শুয়েছিলেন নিউটন বর্মা। মণীশকে দেখে নিউটন বর্মা বললেন, 'মণীশ, আজ তোমাকে একটু আপসেট দেখাচ্ছে—'

মণীশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, 'না, এই বাবুর শরীরটা আজ নেই।' কান চুলকে পাশের ঘরে ঢুকতে গেলেন মণীশ।

বাধা দিয়ে নিউটন বর্মা বললেন, 'ওকি। শোবার ঘরে গিয়ে কী হবে?'

'বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। তাই—

'আগে কাজ সেরে নাও, তারপর শুয়ে নিও কিছুক্ষণ।' বললেন বর্মা।

সম্মতি জানিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন মণীশ। নিউটন বর্মা পেছনে পেছনে উঠে এলেন। বীভৎস মুখ। সঙ্গে সঙ্গে চলল তাঁর প্রিয় হাউন্ড। লম্বা লম্বা ঠ্যাং। চোখ দুটো সর্বদাই জ্বলছে।

নিউটন বর্মা পাশের ঘরে পৌঁছে দেখেন মণীশ আইচ ছবিগুলোর ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী যেন দেখছেন। নিউটন বর্মার পায়ের শব্দ শুনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন মণীশ। একটু কি চমকে উঠলেন? কুকুরটা গরগর করে উঠল।

নিউটন বর্মার বুঝতে আর কিছু বাকি ছিল না। কারণ তখন তিনি কানের পেছনের তিলটা দেখতে পেয়েছেন। শীতল কণ্ঠে বললেন, 'মিঃ আইচ, মণীশ কোথায়?'

'তার মানে?' বাবু আইচ ব্যাপারটা তখনো উপলব্ধি করতে পারেননি।

'উঠে আনুন ওখান থেকে। কঠোর কণ্ঠ নিউটন বর্মার।

সন্ত্রস্ত পদে গুটি গুটি করে উঠে এলেন বাবু আইচ। এসে দাঁড়ালেন

নিউটন বর্মার মুখোমুখি। বললেন, ‘ভালো করে তাকাও, বর্মা। আমি মণীশ, বাবু নই। তাঁর কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

মৃদু হাসলেন নিউটন বর্মা। বাবু আইচের চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে বললেন, ‘টাইগার—’

গরগর করে উঠল বিশাল হাউন্ডটা। টান টান হয়ে দাঁড়াল—যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একটু যেন ভয় পেলেন বাবু আইচ। নিউটন বর্মা তখন বলে চলেছেন, ‘মিঃ আইচ, আমি জানি আপনি ইন্টারপোলের এজেন্ট। একথা মণীশ নিজের মুখে আমাকে বলেছে। আর এ-ও বলেছে যে সে কোথা থেকে এত টাকা ইনকাম করে তা আপনি জানেন না। মণীশকে প্রায়ই আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু ও পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। আপনি জানেন যে কোনো একটা দল আজকাল ছবি নকল করে ধনী ব্যক্তিদের। যাদের বিখ্যাত সব ছবি কেনার শখ আছে—কনটিনিউয়াসলি ঠকিয়ে আসছে তাদের।

‘কিন্তু এটা জানতেন না যে এর পেছনে আপনার ভাই মণীশ আইচ আছে। আপনি হয়তো মণীশের কাছ থেকে কোনো রকমে ঠিকানা জেনে নিয়ে খোঁজ নিতে এসেছেন। কিন্তু তিলটা—ওই তিলটাই আপনাকে ধরিয়ে দিল।’

‘বর্মা, তুমি অবুঝ হোয়ো না। তিলটা নকল—এই—’

বাবু আইচের কথা শেষ হবার আগেই নিউটন বর্মার নির্দেশে টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। পকেট থেকে রিভলভার বের করারও সুযোগ পেলেন না বাবু আইচ। টাইগারের কামড়ে তাঁর কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। নির্বিকার মুখে তখন মশলা চিবোচ্ছেন নিউটন বর্মা।

পরদিন সব জানাজানি হল, কাগজে ছবি ছাপা হল। পুলিশ কিন্তু দেহের কোনো হদিশ পেল না—

এইবার বাধা দিয়ে চন্দন বললেন, ‘মিঃ নিউটন, আপনার টাইগার মোটা হয়েছিল তো?’

‘হ্যাঁ, একটু বাঁকা হাসি ছড়িয়ে পড়ল নিউটন বর্মার মুখে : ‘তা

একটু মোটা হয়েছিল বইকি—অত বড় লাশটাকে হজম করলে যে কেউই মোটা হবে।'

'আপনি দেখছি গুণী লোক।' হাসলেন দেবনাথ।

'এসব অভ্যেস-টভ্যেসগুলো একটু হাতসই রাখতে হয়—'

যাক, তারপর বলুন।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম—এরপরই আমি মণীশের একটা ফোন পেলাম। সে আমাকে দেখে নেবে বলেছে। নোংরা ব্যবসা করলেও সে তার দাদাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। তাই—'

'ও, তার মানে সে আপনাকে দেখে নেবার আগেই আপনি তাকে আমাকে দিয়ে দেখে নিতে চাইছেন।'

'ঠিক তাই।'

'সে জানে আপনি ভাড়াটে লোক লাগাচ্ছেন?'

'জানে না—জানবে।' পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে টেবিলে রাখলেন নিউটন বর্মা। বললেন, 'দু-হাজার আছে—অ্যাডভান্স। ওকে সরাবার জন্য আপনি যে-কোনো উপায় নিতে পারেন—'

চন্দন দেবনাথ হাসলেন ঃ 'খোদা ঘর দেতা হ্যায়, ছপ্পড় ফাড় কর দেতা হায়।' আগে ব্যাপারটা তলিয়ে না দেখে কাজে নামছেন না তিনি। কারণ নিউটন বর্মা শেয়াল।

নিউটন বর্মা যখন বিদায় নিলেন, রাত তখন সোয়া দুটো।

পরদিন সন্ধ্যার দিকে বাবু আইচের বাড়ির দিকে রওনা হলেন চন্দন দেবনাথ। মণীশের ঠিকানা তাঁকে নিউটন বর্মাই দিয়েছিলেন। বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন বাবু আইচ—সম্পূর্ণ নিজে। মণীশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি চাননি যে মণীশ বিপথে যায়, তেমনি মণীশও সেই ভালোবাসার মর্যাদা দিয়েছিল বাবু আইচকে সম্মান করে। তাঁকে কখনো মণীশ দুঃখ দিতে চাননি।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে বেল টিপলেন দেবনাথ। মিনিটখানেক পরে দরজা খুলে গেল। চন্দন দেবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে নিউটন বর্মার ফটোর মুখ। আর কোনো ফটো জোগাড় করতে পারেননি বলে মণীশের আগের তোলা একটা ফটো দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই তাঁর চেহারার

কোনো পরিবর্তন হয়নি।

চন্দন দেবনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমার নাম চন্দ দেবনাথ—মিথ্যান্বেষী। আপনার ভাই বাবু আইচের মৃত্যু সম্বন্ধে (তথ্যগুলো আমি জানতে পেরেছি, তা আপনাকে জানাতে এসেছি।'

'—ও, ভেতরে আসুন।' বাবু আইচের মৃত্যুর তদন্তের কথা শু৫ তিনি একটু চমকালেন না মনে হল।

মণীশ আইচের পেছন পেছন বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলে চন্দন। চেয়ারে বসে একটু কেশে নিয়ে মণীশ বললেন, 'কিন্তু মিস্টার ওই যে বললেন মিথ্যান্বেষী না কি—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে দেবনাথ বললেন, 'মুভিং লাই ডিটেক্টা বলতে পারেন। এই যে মিথ্যে কথা—সে যাই হোক না কেন, আমি মিথ্যে বলে বুঝতে পারি। যেমন ধরুন না কেন বাবু আইচ নিরুদ্দেশ হননি, তাঁকে খুন করা হয়েছে; আর খুন করেছেন আপনার ব্যবসার অংশীদার শ্রীনিউটন বর্মা।'

'নিউটন বর্মা?' সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানলেন মণীশ আইচ।

'হ্যাঁ, সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, ওই নামটাই তিনি আমার কাছে বলেছেন।'

'হবেও বা। যা হোক, বলুন আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

'আপনার কাছে খুব ধারালো প্লাস আছে?'

এই প্রশ্নে একেবারে ঘাবড়ে গেলেন মণীশ আইচ। উঠে গিয়ে পেছনের দেওয়ালের সঙ্গে যে সেলফ আছে, তা থেকে একটা প্লাস বের করে আনলেন তিনি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন চন্দন। এবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্বরে বললেন বাঃ, কী সুন্দর! এতেই হবে। এবার আসল কথা শুনুন, পুরো ব্যাপারটা আমি জানতে পেরেছি, বুঝতে আর কিছুই বাকি নেই আমার। আপনি যদি আপনার ভাইয়ের মৃত্যুশোক ভুলতে চান, তবে কাল ভোরবেলা নিউটন বর্মার বাড়ির কাছাকাছি যে টাওয়ার আছে, তার কাছে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। গুডবাই—'

যেমন ভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই ছুট করে বেরিয়ে গেলেন চন্দন দেবনাথ। মণীশ এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে তখন প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।

বাড়ি ফেরবার পথে নিউটন বর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন দেবনাথ। তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন কী কী করতে হবে। তারপর শিস দিতে দিতে নাইট ক্লাবের দিকে চললেন। কারণ টাকা-পয়সার একটু টানাটানি চলছে। যশোবন্তর সঙ্গে খেলে সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।

শহরতলীর সকাল যে এত সুন্দর হয়, তা বোধহয় মণীশ আইচ বা চন্দন দেবনাথ জানতেন না। নিউটন বর্মা তখনো এসে পৌঁছোননি।

তাঁরা দুজনে দাঁড়িয়েছিলেন পাহাড়ের পাদদেশে। তা পাহাড়ই বলতে হবে এই টাওয়ারটাকে। অন্তত চওড়ায় না হোক লম্বায় তো নিশ্চয়ই। নীচে থেকে তারা দেখতে পাচ্ছিলেন ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে। অনেক উঁচুতে টাওয়ারটা শেষ হয়েছে। ওটার মাথায় লাল বাল্‌ব তখনো জ্বলছিল। বোধহয় এরোপ্লেনকে সতর্ক করার জন্য।

এমন সময় দূরে দেখা গেল নিউটন বর্মাকে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। মনে মনে হাসলেন চন্দন দেবনাথ। বাকি তিন হাজার নেবার জন্য প্রাণ আইঢাই করছিল।

নিউটন বর্মা এগিয়ে এলেন। একটু হেসে বললেন, 'চলুন মিঃ দেবনাথ, ওপরে ওঠা যাক। এসো মণীশ, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

তিনজনে কাঠের সিঁড়িতে পাশাপাশি একসঙ্গে পা ফেলতে লাগলেন। সেই শব্দ ক্রমে ক্রমে ওপরের দিকে মিলিয়ে গেল।

একেবারে ওপরে চলে এসেছেন তাঁরা। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। দূরে সরু ফিতের মতো একটা নদী দেখা যাচ্ছে। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা। নীচের লোকগুলোকে ঠিক লিলিপুটের মতন দেখাচ্ছে।

'অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য!' মন্তব্য করলেন চন্দন দেবনাথ।

এই মন্তব্যে অন্য দুজনেই ফিরে তাকালেন। একটু অবাক হলেন

এই অদ্ভুত কবিত্ব প্রকাশে। নিজেকে প্রস্তুত করে নিউটন বর্মা বললেন 'মণীশ, এই যে ভদ্রলোককে দেখছ—ইনি আমার ভাড়া করা লোক আমার বক্তব্য তুমি সব ব্যাপার ভুলে যাও। আমি তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছি। হাজার হলেও একটা অবোলা জীব এই কাজ করে ফেলেছে! যাকগে, তুমি রাজি আছ?'

দড়ির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মণীশ আইচ। চিন্তা করতে লাগলেন। নীচের চলমান খেলনার (?) যানবাহনগুলো দেখছিলেন নিউটন বর্মা ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'নয়তো আমরা তোমার মৃত্যুর সাক্ষী থাকব, মণীশ—'

দড়ির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন চন্দন। নির্বিকার চিত্তে, কোনার খুঁটিটায় হেলান দিয়ে।

যে জায়গাটায় তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানটা কাঠের পাটাতন দেওয়া চতুষ্কোণ। তার চারকোণে চারটে ছোট ছোট কাঠের খুঁটি, আর দড়ির রেলিং দেওয়া।

এপ্রান্তের খুঁটির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন মণীশ আইচ। আর দুজনের মধ্যে দড়ির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিউটন বর্মা। তিনি চন্দন দেবনাথকে চোখের ইশারা করলেন। বললেন পরক্ষণেই, 'মণীশ, দেখো, কী সুন্দর!'

মণীশ খুঁটি ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই প্লাস দিয়ে দড়ি আর খুঁটির মধ্যেকার তারটা কেটে দিলেন। আর এ-প্রান্ত থেকে দড়িটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলেন মণীশ আইচ।

কাঠের পাটাতনের আওতার বাইরে চলে গেলেন নিউটন বর্মা। তাঁর হাত থেকে দড়ি ছেড়ে গেছিল। পড়তে পড়তেই তিনি শুনতে পেলেন চন্দন দেবনাথের গলা ঃ 'আমি ঠিক প্রফেশনাল কিলার নই; তাই জানতে চাই ভিক্টিম কে—'

গোত্তা-খাওয়া জেট প্লেনের মতো নীচে পড়ছেন নিউটন বর্মা। তাঁর স্বআবিষ্কৃত (?) মাধ্যাকার্ষণ শক্তি যে এত জোরদার, তা তিনি আগে জানতেন না। তাঁর এই সবেগে পতন একটা খুব শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের কাজ করছিল। কারণ একেবারে নীচের সুন্দর দৃশ্য ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে

সুন্দরতর হয়ে তাঁর চোখে ধরা দিচ্ছিল।

পৃথিবী যেন কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মতন তাঁর দিকে ধেয়ে আসছিল। ওই অবস্থায়ই তিনি তখন ছুটে চলেছেন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে।

একটু হাসলেন মণীশ আইচ। বললেন, 'মিঃ দেবনাথ, আপনি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমিই বাবু আইচ?'

হ্যাঁ। আপনি যখন উঠে গ্লাসটা আনতে গেলেন, তখনই তো দেখলাম কানের পেছনের তিলটা। আপনি নিউটন বর্মার খোঁজ কি আগেই পেয়েছিলেন?'

আমি মণীশ আর নিউটন বর্মার ব্যবসা কী জানতে পেরেছিলাম। জানতাম যে মিঃ বর্মা আমার পরিচয় জানেন। তাই তাঁর মনের ভাব কী হয় জানবার জন্য মণীশকে আমার জামা-কাপড় পরিয়ে আর তিলটা বসিয়ে বর্মার কাছে পাঠিয়েছিলাম। মণীশকে বলেছিলাম একটা মজা হবে। কিন্তু সেটা যে এই রকম...কেঁদে ফেললেন বাবু আইচ। একটু পরে বললেন, 'মিঃ দেবনাথ, এই নিন আপনার পাওনা তিন হাজার টাকা—'

টাকাটা পাজামার পকেটে পুরে দেবনাথ বললেন, 'আপনি যে ধাক্কা দেননি, তার সাক্ষী আমি; আর আমি যে ধাক্কা দিইনি, তার সাক্ষী আপনি। এটা একটা—

'দুর্ঘটনা,' কথা শেষ করলেন বাবু আইচ, 'চলুন, এবার নামা যাক। মনে হয় পুলিশ এসে পড়েছে।'

'তবে মনে হয়, অনীশদাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না, বলতে বলতে স্বগতোক্তি করলেন চন্দন, 'তাকে সব খুলে বলতেই হবে।'



রাবণ বধ

অনীশ চৌধুরী একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন হাতের পাণ্ডুলিপিটার দিকে। সেই আগের মতোই হাতের লেখা,—খুব চেনা চেনা। কোথায় যেন এই লেখা দেখেছেন তিনি! কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। তাই কাগজগুলোর শেষ পৃষ্ঠার নীচের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তিনি— 'আরে তাই বলি,—সেই ছোঁড়াটা। নাঃ, জ্বালালে দেখছি—এবারেরটা আবার বানানো গল্প না তো?'

লেখাটা পড়বার আগে পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া তারিখের আগের দিনের খবরের কাগজ বার করলেন তিনি; চোখ বোলাতে থাকলেন। 'আরে—এই—তো। খবরের কাগজের ভাষায় লেখাটা ছিল এইরকম। 'আজ ১২ মার্চ, এক বিশিষ্ট শিল্পপতি অঘোর সরখেল ও পুলিশ ইন্সপেক্টর আনন্দ

সান্যাল একটি হোটেলে বসিয়া কিছু গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় অঘোর সরখেলের ভাইপো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাহারা তিনজনে কথা বলিতে থাকেন। হঠাৎ শ্রী অঘোর সরখেল একটি নতুন প্যাকেট হইতে ছিড়িয়া দেওয়া বিস্কুট চিবাইয়া গলাধঃকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিশেষজ্ঞদের মতে মৃত্যুর কারণ পটাশিয়াম সায়ানাইড।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে অঘোর সরখেলের পাকস্থলী ছাড়া আর কোথাও বিষের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

কাগজটা নামিয়ে রাখলেন অনীশ চৌধুরী। ব্যাপারটা এবার কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন তিনি। এইবার তিনি পাণ্ডুলিপিটা পড়তে শুরু করলেন। কোনো ঠিকানা নেই—

১৪/৩/৬৯

নমস্কার সার—

পৃথিবী গোল। না হোলে আপনাকেই বা আবার লিখতে হবে কেন, আর বেটা অঘোর সরখেলের সঙ্গেই বা আমার দেখা হবে কেন? হারামজাদাকে খুন করেচি। আগে আপনাকে বলেচিলুম যে যাকেই আগে পাব, তাকেই শেষ করব—তাই করেচি; কাকুর হাড়ে হাওয়া লাগিয়ে দিয়েচি।

এখন আমি খুব হাসচি সার, খুব হাসচি। এত হাসি পাচ্ছে না, যে কী বলব। খবরের কাগচে পড়েচেন নিশ্চয়। জানি না মোরার সময় 'আমার কাকুর' (মাইডিয়ার আংকোল?) আগেকার কথা—সেই বেহিসাবি চিটিংবাজির কথা মোনে পোড়েচিল কিনা?

সার আপনি তো অনেক পড়াশোনা করেচেন—অনেক পোড়েচেন—আপনি হয়তো জানবেন পোরিববহন কাকে বলে? (আশ্চয্য হবেন না—প্রথোম ব্যাপারের পর একজনের কাছ থেকে জেনেচিলুম—এই কথাটা, আর তার মানেটা) এটাও সেই কেস সার।

পুলিশ কোনো সুত্রো পায়নি। (আপনিও পাবেন না)—এটাকে তাই আমার একটা 'হাতের কাজ' বলতে পারেন।

বোহুদিন আগের কথা মোনে কোরেই গিয়েচিলুম অঘোর সরখেলের কাচে।—'ওর বাড়িতে'—(বুঝতে পারচেন নিশ্চোয়ই—যেন শালার দেবোত্তর সম্পোত্তি।)—কাকু (কাকু-উ-উ-ঃ) এগিয়ে এলেন—বোললেন, যে বাবা; সারস্বত অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়? বোসো (বসবার জন্যই তো এসেছি বাওয়া। বলো কী দরকার? (অনেক কিছু—যেন তর আর সইছে না)—বোললুম, 'কাকা—আমি না খেয়ে আছি। (সোমপূন্ন মিথ্যে সার, কাকু একটা সূত্রো পেয়েছিল—তা হোল আমার গায়ের জামা-কাপড়। ওগুলো দেকে অন্ততো বোঝা উচিত ছিল যে আমি খেয়ে আছি—না খেয়ে নয়।) তোমার একোন কত নাম, আমার একটা বেবস্থা কোরে দাও—যা হয়। যে-কোনো কাজ পেলেই কোরব। (চোখে জল এনে ফেলেছিলুম, যেমন করে মাতোকে ভুলিয়েছিলুম—বায়োস্কোপের মতো।) একটু ভেবে কাকু বললেন, 'সারু, কাল তুই আমার সঙ্গে "ডিমল্যান্ড" (নামটা জবর—কেমন যেন আঁসটে গন্ধো) হোটেলে দেকা কোরিস। আমি একোন একটা ঝামেলায় (কারো ঘাড় ভাঙার ব্যাপার নাকি?) আচি।' আমি চোলে এলুম ওকান থেকে। শালা, সেই পুরোনো ধোকা নাকি? ঝামেলায় আচে কাকু, কী ঝামেলা?

পরদিন গেলুম হোটেলে। সঙ্গে দুটো জিনিস, তার মধ্যে একটা পটাশিয়াম সায়ানাইড। আর একটা কী বোলুন তো সার?

গিয়ে দেকি, কাকু আর একজন পুলিশ একটা টেবিলে বোসে আচে। তারা চা খাচ্চিল। আমি যেতে কাকু বোলল, 'আয় বোস। আমি কাকুর সামনের চেয়ারে মুকোমুখি বসলুম। এমোন সোময় কাকু এক প্যাকেট বিসকুটের অরডার দিল। আমি নেরেচেরে বোসলুম। বিস্কুট এসে গেল টেবিলে। কাকু বললেন, 'নে সারু, খা।' আমি প্যাকেটটা ছিঁড়ে পুলিশবাবুর

সামনে ধোরলুম, বোললুম, 'নিন, সার।' উনি একটা তুলে নিলেন। আমি এবার একটা বিসকুট নিয়ে কাকুকে দিলাম। তারপর একটা বিসকুট নিজে নিয়ে কামোর দিলুম।

এরপরই সার বিপর্য্যয় যাকে বলে। কাকু হুমরি খেয়ে দমাস কোরে পোড়লেন টেবিলে, আর নোড়লেন না। আমি আর পুলিশবাবু যেন চাবুকের ঘা খেয়ে উঠে দাঁড়ালুম; (অভিনয়?) আমি বোললুম, 'কাকা—কাকা—া—া' ('কাক ডাকে কা—কা—আগে অ পরে আ'—সেই রোকম কোরে)—পুলিশবাবু গায়ে হাত দিয়ে দেকলেন; তারপর বোললেন, 'ডেড। (মানে মোরে গ্যাচে। অ্যাঁ—বিশ্বাসই হোতে চায় না—একটুকুন ওষুধের এত জোর?) আমার কাজ শেষ হোল।

সার, পুলিশ কিন্তু একটা সূত্রো পেয়েচিল। তারা আমার পকেটে এক প্যাকেট সদ্যো কেনা বিসকুট পেয়েচিল। এবারে সব খুলে বলি। আমি বিসকুটের প্যাকেট নিয়ে গেচলুম এই জোন্যে যে কাকু যোদিও বিসকুট না কেনে, তোবুও মোরতে হবে কাকুকে।

আর সায়ানাইড—ওটা ছিল আমার হাতের আঙুলে। তর্জ্জনী আর বুড়ো আঙুলে ধরে বিসকুটটা যকোন কাকুকে দিলাম কাকু অপর দিকটা ধোরলেন। তারপর ধোরেই আমার 'ধরা' দিকটা সিধে মুখের মধ্যে—ব্যস—আঙুল থেকে বিসকুট, বিসকুট থেকে সিধে কাকুর পেটে, (কী সুন্দোর পোরিবহন? তাই জিজ্ঞাসা করচিলুম যে পরিবহণ মানে আপনি জানেন কিনা?) কাকু টেরও পেল না। সাক্ষী?—আমি যে নির্দোষ তার সাক্ষী পুলিশবাবু নিজে।

এ খুনে খরচ একটু বেশি হোলেও তা পুষিয়ে গ্যাচে। মা-বাবা—তোমরা দেকো, তোমাদের সারু, (আর মাতো? তুইও দেক, তোর দাভু।) তোমাদের ওপর অবিচারের বদলা নিয়েচে। অঘোর সরখেল পৃথিবীতে নেই। শালাকে মইয়ে চড়িয়ে ওপরে

তুলে দিয়েছি—তারপর?—তারপর সার মই কেড়ে নিয়েচি।—সার আমার প্রণাম নেবেন।

—ইতি—

সারস্বত (দাত্তু)

অনীশ চৌধুরী ভাবলেন, ওরা সারস্বতের পকেটে সায়ানাইড পেল না কেন? সায়ানাইড কি গাম ছিল? তিনি ফোন তুললেন ডায়াল ঘুরিয়ে বললেন, 'হ্যালো, আনন্দ আছে নাকি?—আমি অনীশ চৌধুরী কথা বলছি।'

(অসমাপ্ত)

বড় গল্প



অনীশ চৌধুরীর বর্ণপরিচয় ও কুকুরের মৃত্যু

এক

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী। বয়স খুব কম, ছাব্বিশ-সাতাশ হবে, তার পরনে একটা স্লিপিং গাউন। মাথার চুলগুলো এলোমেলো; বাইরের আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। কয়েকটা তারা জাগুয়ারের চোখের মতো জ্বলছে নিবছে, মিটমিট করছে। কাছাকাছি কোনো শীতার্ত কুকুরের ডাক শোনা গেল।

দু-হাতে রড চেপে ধরে, মুখটা দুই রডের ফাঁকে রাখলেন অনীশ চৌধুরী। শীতের হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে তার চোখে-মুখে লাগছে। বাইরের সোজা রাস্তাটা ঠান্ডা ভাঙাচোরা চাঁদের আলোয় কোনো এক রং বদলকারী মায়াবী ময়াল সাপের মতো দেখাচ্ছে।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উড়ে এসে জোট বেঁধে যেন কিছু একটা করার চেষ্টায় এধার-ওধার করে বেড়াচ্ছে।

নিজের রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির উপর নজর দিলেন তিনি। এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট-এর কিছু বেশি। কিছুটা চিন্তিত মনে হল অনীশ চৌধুরীকে।

মোতি চৌধুরীর কথা ভাবছিলেন তিনি। তার স্ত্রী মোতি চৌধুরী। বাইশ বছরের যুবতী। ওর তো এখনই ফেরার কথা, এখনও ফিরছে না কেন? অবশ্য ওর শেভ্রলে গাড়িটা নিয়েই গিয়েছে। তবু মোতির এর মধ্যেই ফেরা উচিত ছিল।

এই সব সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতে বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। পাশে রাখা টিপয় থেকে জলভর্তি গ্লাস তুলে নিলেন। এক ঢোঁক খেয়ে আবার ঢাকা দিয়ে রাখলেন গ্লাসটা।

তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। তার খুব ঘুম পাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

খানিক বাদেই গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অনীশ চৌধুরীর। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। সত্যিই তাই। গাড়ির দরজা বন্ধ করে বাড়িতে ঢুকল মোতি।

আবার বিছানায় গিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন তিনি। তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেন। মোতি উপরে উঠে আসছে।

অথচ পায়ের শব্দ এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। কী ব্যাপার, মোতি বাথরুমে গেল কেন? কিছুক্ষণ পরেই কিছুতে জল ভরার শব্দ পেলেন অনীশ চৌধুরী তারপর মোতির বেরিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দ। মোতি কি আবার কোথাও যাবে? তবে ও সঙ্গে করে জল নিল কেন?

হঠাৎই আবার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসার শব্দ। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল মোতি চৌধুরী। অনীশ চৌধুরী টের

পেলেন যে ও তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণ পর অনীশ চৌধুরীকে ঠেলা দিল মোতি চৌধুরী। ডাকল, 'এই, শুনছ?...এই—'

—'কী ব্যাপার?' আড়মোড়া ভেঙে বিছানার উপর উঠে বসলেন অনীশ চৌধুরী।

—'একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে,' ধীরে ধীরে বলল মোতি চৌধুরী, 'আজ গাড়ি করে ক্লাবে ফেরার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে;—একটা সাদা কুকুরকে চাপা দিয়ে ফেলেছি আমি। আমার কী দোষ বলো? রাস্তা খালি দেখে মোটামুটি জোরেই চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ সাদা রঙের কী একটা লাফিয়ে এসে গাড়ির গায়ে লেগে ছিটকে পড়ল। তাই দেখে গাড়ি থামালাম আমি। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা সাদা রঙের কুকুর মরে পড়ে আছে। কুকুরটার গা থেকে রক্ত বেরোয়নি। মনে হল কুকুরটা ভেতরের ফ্র্যাকচারে মারা গেছে। তবুও আমি ওটাকে পিছনের সিটে তুলে গাড়ি চালিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার বললেন ওটা মারা গেছে। বাঁচাবার কোনো উপায়ই নেই। তখন ওটাকে নিয়ে এসে ক্লাবে যাওয়ার পথে, ক্লাবের কাছেই, একটা ঝোপের ধারে ফেলে দিয়েছি।

'তারপর ক্লাবে ঘণ্টাখানেক তাস খেলে বাড়ি ফিরে গাড়ি থেকে নামবার সময় দেখি পেছনের সিটে রক্তের দাগ। অথচ রক্তের দাগ লাগার কথা নয়, কারণ কুকুরটার বডি থেকে কোনো রক্তপাতই হয়নি। এখন রক্তের দাগ দেখে জল দিয়ে ওঠাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু উঠল না। এখন যার কুকুর সে যদি...'

'ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, মোতি,' সান্ত্বনা দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'কেউই তো তোমাকে দেখতে পায়নি।'

—'ওইখানেই তো একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে আমার। কুকুরটা যদিও পোষা বলে মনে হল, তবুও ভালো করে দেখেছি ওটার গলায় কোনো বকলস ছিল না। আমি যখন ওটাকে ফেলে দিয়ে ফিরে আসছি তখনই দেখি ইন্সপেক্টর শ্রুতিধর সামন্ত দাঁড়িয়ে। আমি তাকে ডাকলাম, দুটো কথা বললাম। তারপর উনিও হেসে চলে গেলেন। আমার তখন

খেয়াল ছিল না। নয়তো ওকে ডাকতাম না।'

—এটাই তোমার খুব বোকামি হয়েছে, মোতি,...একী? কী এটা?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন অনীশ চৌধুরী। একটা জোরালো টর্চের আলো দূরের অন্ধকারে গাড়িটার আশেপাশে ঘুরছে। টর্চধারীকে দেখা যাচ্ছে না।

—'এক মিনিট, মোতি। আমি দেখে আসছি ওখানে কী হচ্ছে?' বলে গমনোদ্যত হলেন অনীশ চৌধুরী।

—'না, না, তুমি যেও না—আমার ভয় করছে। ওকী? শীগগিরই দেখো।' জানালার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মোতি।

টর্চের আলোটা ততক্ষণে হতভম্ব অনীশ চৌধুরীর চোখের সামনে দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে।

দুই

সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। ধীরে ধীরে সেই আগন্তুকের পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে লাগল। ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে মোতিকে চুপ করে থাকতে ইশারা করে, দরজার গায়ে লেপ্টে দাঁড়ালেন মিঃ চৌধুরী। পায়ের শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাদের ঘরের দিকে। ক্রমে ক্রমে সেই ভারী বুটের শব্দ এসে থমকে দাড়াল ঘরের দরজার সামনে। একটা বলিষ্ঠ, সবল হাত হঠাৎ এক ঝটকায় দরজার পর্দাটা সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তেই একটা আবছা দেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

টর্চটা তখন আর জ্বলছিল না। একটা ভারী এবং দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মিঃ চৌধুরী, দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে আসুন; আপনার স্ত্রীকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন অনীশ চৌধুরী। বিস্ময়ে, ভয়ে তিনি দিশাহারা, হতভম্ব।

মোতি চৌধুরী ইতিমধ্যে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এইবার মুখ তুলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে অনুপ্রবেশকারীর দিকে তাকালেন অনীশ চৌধুরী।

অনুপ্রবেশকারী আগন্তুক পকেট থেকে একটা আইডেন্টিটি কার্ডের মতো কী বার করে দেখিয়ে আবার সেটা পকেটে রেখে দিল।

ঠিক এই সময় এগিয়ে এল মোতি চৌধুরী; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজনটা কিন্তু বলেননি মিস্টার...!'

—'লাহিড়ী,—সুনু লাহিড়ী।' মাথার চুলে একবার আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে বলল সুনু।

—'আপনিই?' এবারের প্রশ্নটা এল অনীশ চৌধুরীর কাছ থেকে।

—'আজ্ঞে, হ্যা—আমিই।' অতীব বিনীত স্বরে জবাব দিল সুনু। তারপর মোতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আজ গাড়ি চালিয়ে ক্লাবে যাওয়ার সময় এক ভদ্রলোককে চাপা দিয়েছেন। ডাক্তার পরীক্ষার পর বলেছে হয় কোনো ভারী ভোঁতা জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে অথবা গাড়ির তলায় হয়ত থেঁতলানো হতে পারে।

'আপনার পক্ষে দ্বিতীয়টাই সুবিধাজনক। তাই না, মিসেস? আর মৃত ব্যক্তি তো আপনাদের খুবই পরিচিত। তিনি হলেন প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়, আপনার স্বামী তাঁকে ভালোভাবেই চেনেন। তিনি লোহার ব্যবসা করতেন। সম্প্রতি অন্য কোনো সাইড বিজনেস খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি, বয়স তো বেশি যে হয়নি তা নিশ্চয়ই জানেন। আমি প্রথমে তাঁর পকেটে পাওয়া ঠিকানা দেখে তাঁর বাড়ি গেছিলাম। দুঃখের বিষয় সেটা একটা ছোট বাড়ি, খোঁজ নিয়ে জানলাম তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন এখানে নেই। ঠিকে ঝি কাজ সেরে দিয়ে বাড়ি চলে যায়, তিনি একাই থাকেন।

'তারপর ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে দেখা হল ইন্সপেক্টর শ্রুতিধর সামন্তর সঙ্গে। তিনি জানালেন যে আপনি গাড়ি করে, মৃতদেহ যেখানে আবিষ্কার করা হয়েছে, সেখানে গেছিলেন। তারপর আপনার বাড়ি এসে চারদিকটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। আর কোনো উপায়ই নেই মিসেস চৌধুরী, আপনাকে আমার সঙ্গে আসতেই হবে।'

সুনু একটা পাইপ ধরালো।

—'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না। মিঃ লাহিড়ী?' ব্যাকুল

কণ্ঠে প্রশ্ন করল মোতি।

—'এখনই হয়তো যেতে হোত না মিসেস চৌধুরী, কিন্তু আমি ঘুরে ফিরে যা দেখলাম তাতে আপনাকে এখনই নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। যেমন শুনুন। গাড়ির পিছনের সিটের উপর রক্তের দাগটা বোধহয় আপনি খেয়াল করেননি, মিসেস চৌধুরী। আর মিঃ চৌধুরী, ওই রক্তের দাগটা তোলবার জন্য যে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে তা সিটের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন নাকি, মিঃ চৌধুরী?'

—'আমি? নাঃ।' অনীশ চৌধুরী নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—'মিসেস চৌধুরী, চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই।'...সুনু পুনরায় বলল।

—'মিঃ লাহিড়ী,' বাধা দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'আমি চাই যে এত রাতে আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে না বেরোক। এর মানে এই নয় যে আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি। জানেন তো শীতের রাত, এখন প্রায় একটা বাজে, কিছু একটা ঘটে গেলে।...আচ্ছা—আমি সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে?'

—'আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যা করবার একটু তাড়াতাড়ি করুন প্লিজ, কারণ আমারও একটু তাড়া আছে।'

মিনিট দশেকের ভেতরই তৈরি হয়ে নিলেন অনীশ চৌধুরী ও মোতি চৌধুরী।

অনীশ চৌধুরী দরজার চৌকাঠে পা দিয়ে বললেন, 'সুনু বাবু, আসুন যাওয়া যাক।'

—'চলুন।'

দরজায় তালা লাগাল মোতি চৌধুরী। তারপর অনীশ চৌধুরীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো, লাহিড়ীবাবুর নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

—'আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলিনি, মিসেস চৌধুরী, আমার সত্যিই তাড়া আছে। আপনার ওসব বাঁকানো কথা এখন জমা করে রাখুন। কাঠগড়ায় উঠে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

মোতি চৌধুরী কিছু বলল না।

তিন জোড়া পায়ের শব্দ সদর দরজা ছাড়িয়ে ক্রমে রাস্তায় নামল। তারপর দূরে মিলিয়ে গেল।

রাত তখন একটা বাজে।

তিন

—'চৌধুরী, এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?' অনীশ চৌধুরীকে বোঝাচ্ছিলেন। নরহরি চাকলাদার; দুঁদে ব্যারিস্টার তিনি। এখনও বেশ ভালো পসার। একথা বলছি কারণ তার বয়স বর্তমানে প্রায় ৪৫ বছর। চেহারা মোটামুটি শক্ত-সমর্থ; অন্যান্য কাজ কর্ম প্রায় করেনই না। শখের মধ্যে শুধু কাঠের সৌখীন জিনিস তৈরি করা। কথা বলতে বলতে তিনি পানের ডিবে বার করলেন। তারপর সেটা থেকে একটা পান বার করে মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে জাবর কাটতে কাটতে বলতে শুরু করলেন, 'বলি শোনো, তোমার বউয়ের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট কোনো প্রমাণ তো পায়নি! তবে এত ভেঙে পড়ার কী আছে?'

—'আছে,—নরহরিদা,—আছে।' বিমর্ষ কণ্ঠে জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'ওরা মোতির বিরুদ্ধে সারকামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স যা পেয়েছে তাতেই ওর জেল খাটা কেউ রোধ করতে পারবে না। আপনি বুঝতে পারছেন না নরহরিদা যে জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

—'অনীশ, দুঃখ কোরো না। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করা। তুমি ভেব না, কোর্টে যদিও বা কেস ওঠে, আমি মোতির হয়ে দাঁড়াব, আমি চেষ্টা করব ও যাতে সন্দেহের অবকাশে ছাড়া পায়।' অনীশ চৌধুরীকে সাহস দেবার চেষ্টা করলেন নরহরি চাকলাদার, 'আচ্ছা—, মোতি কাল রাত ক'টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?'

—'প্রায় আটটার সময়। বলেছিল প্রথমে পার্টিতে যাবে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকেই ওখান থেকে ক্লাবে চলে যাবে। সাড়ে এগারোটার

সময় ফিরবে বলেছিল। তারপর সব ঘটনা তো জানেনই।'

—'ক্লাবে ও কতক্ষণ তাস খেলেছিল, চৌধুরী?'

—'ঘণ্টাখানেক, কি তার কিছু বেশি।'

—'ক্লাবে তিনি ক'টায় পৌঁছেছিলেন, মিঃ চৌধুরী?' এই প্রশ্নে সচমকে ঘুরে তাকালেন অনীশ চৌধুরী। দেখলেন তারই আঁকা একটা ল্যান্ডস্কেপের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে যিনি তাকিয়ে আছেন, তিনিই স্বয়ং সুনু লাহিড়ী। প্রশ্নটা এসেছে তার কাছ থেকেই। তিনি পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন।

—'ন'টায় প্রায়।'

—'একটা কথা দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে সেই ভেটেরান ডাক্তার কুকুরটা পরীক্ষা করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। আর আপনার স্ত্রীর কথা মতো কোনো কুকুরই অকুস্থলে পাওয়া যায়নি।

'খুনটা হয়েছে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে। যা হোক, আপনার স্ত্রীকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। তিনি আপনার উপস্থিতি ছাড়া উত্তর দিতে রাজি নন, তাই আপনাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

—'চলুন,' উঠে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী, নরহরি চাকলাদারও প্রস্তুত হলেন যাওয়ার জন্য। তারপর সুনু লাহিড়ীকে অনুসরণ করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন অনীশ চৌধুরী ও নরহরি চাকলাদার।

চার

'প্রায় ন'টায়,'—সুনুর প্রশ্নের উত্তরে এই জবাব দিল মোতি চৌধুরী। একেবারে ভেঙে পড়েছে ও। ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন অনীশ চৌধুরী। পাশে বিভ্রান্তের মতো বসে আছেন নরহরি চাকলাদার।

—'আপনি জানলেন কী করে যে সময়টা ঠিক ন'টা?' কঠিন স্বরে প্রশ্নটা মোতির দিকে ছুড়ে মারল সুনু।

—'আমি ঘড়ি দেখতে জানি, মিঃ লাহিড়ী। আর আমাদের ক্যাটস

আই ক্লাবে বেশ বড় একটা ঘড়ি আছে ক্লাবে ঢোকবার মুখে।' ঘাড় বেঁকিয়ে নখ খুঁটতে থাকল মোতি।

—'আমারই ভুল হয়েছে,' একটু হাসল সুনু, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর আপনি কী করলেন?'

—'ঘন্টাখানেক, কি তার কিছু বেশি সময় ব্রিজ খেলে তারপর বাড়ি ফিরি।

—'আপনারা কে কে খেলছিলেন?'

—'উত্তরটা বোধহয় আমিই ভালো দিতে পারব, মিঃ লাহিড়ী,' হাতের মধ্যে একটা কাচের তৈরি পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করছিলেন নরহরি চাকলাদার, সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আমি, মোতি, আমার স্ত্রী লতিকা আর প্রতীক চোখানি। সেখানে বসে খেলা দেখছিলেন সনৎ সোম। সবাই সবাইয়ের বন্ধু বলতে পারেন। অর্থাৎ, আই মিন, জানাশোনা আছে।"

'আপনার পরের প্রশ্নের উত্তরটা এখনই দিয়ে দিই। এই নিন আমরা বাদে বাকি তিনজনের ফটো। সনৎ সোম, আর প্রতীক চোখানি দুজনেই ব্যাচিলর। আর কিছু?' জানতে চাইলেন নরহরি চাকলাদার।

—'ধন্যবাদ—,' একটু মিষ্টি করে হাসল সুনু, তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'ওহ—হো, আমারই মনে নেই; আপনি তো ব্যারিস্টার। যাক, আনন্দবাবু ফটোগুলো রাখুন।'

—'আপনারা, মানে মিঃ চৌধুরী আর মিঃ চাকলাদার আপনারা একটু বাইরে যান, মিসেস চৌধুরীকে আমার অফিসিয়ালি কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।' এই কথাগুলো বললেন ইন্সপেক্টর আনন্দ সান্যাল, যিনি এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিলেন।

চেয়ার ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুজনে—অনীশ চৌধুরী ও নরহরি চাকলাদার।

আনন্দবাবু রুমাল বার করে ঘাড়টা একবার মুছে নিলেন। এই শীতেও তিনি ঘেমে উঠেছেন। তারপর সুনুর দিকে চেয়ে বললেন, 'নিন, সুনুবাবু, কী জিজ্ঞাসা করবেন করুন।'

—'আমি? এই না বললেন, আপনার অফিসিয়ালি কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে?' বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল সুনু।

—'দূর মশাই। আপনিই তো জিজ্ঞাসা করবেন,' আনন্দবাবুর সহাস্য উত্তর, 'আমার মাথা কি আর আপনার মতো?' সুনু মৃদু হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল মোতির দিকে,—বলল, 'মিসেস চৌধুরী, আপনার কাছে আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি ক'টা প্রশ্নের উত্তর দেবেন।'

—'ক্ষমা চেয়ে আর লজ্জা দেবেন না, মিঃ লাহিড়ী। আমি আমার ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। নিন, যা জিজ্ঞাসা করার করুন।'

'আপনি কুকুরটা চাপা দেওয়ার পর যা যা করেছেন হুবহু বলার চেষ্টা করুন। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।'

—'গাড়ি করে পার্টি থেকে ক্লাবে পৌঁছলাম,' বলতে শুরু করল মোতি চৌধুরী, 'গিয়ে কিছুক্ষণ পর, তাস খেলা শুরু করলাম। মিনিট পাঁচ-ছয় খেলার পর নরহরিবাবু উঠে গেলেন, তার কি ক্যাবিনেট তৈরি করছিলেন ক্লাবের জন্য, তাই তৈরি করতে। সনৎ সোম খেলতে বসলেন। আমি আর লতিকাদি পার্টনার ছিলাম। মিনিট খানেক পর লতিকাদি উঠে গেলেন কফির কথা বলতে। সনৎ সোমও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গেলেন বাথরুমে যাওয়ার নাম করে। ফিরে এলেন মিনিট দশেক পর। তার কিছু পরে নরহরিবাবু এলেন। লতিকাদি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছিলেন। নরহরিবাবু একটা সুদৃশ্য ক্যাবিনেট হাতে করে দেখাতে এনেছিলেন।'

—'এক মিনিট,—আপনি কি কুকুরটা মারার ব্যাপারটা ক্লাবে গিয়ে কাউকে বলেননি?' বাধা দিয়ে সুনু জিজ্ঞাসা করল।

—'সে তো তাস খেলার আগেই বলেছিলাম।'

—'সেই ঘরে আপনারা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ ছিল?'

—'না, আর কেউ ছিল না।'

—'প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় তো ক্যাটস আই ক্লাবেরই মেম্বার ছিলেন, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'ধন্যবাদ, আমার আর কিছু বর্তমানে জিজ্ঞাসা করার নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আসল অপরাধী ধরা পড়বেই।'

—'আমি তবে উঠি।' একজন প্রহরীর সঙ্গে বেরিয়ে গেল মোতি চৌধুরী।

এইবার আনন্দর দিকে ফিরল সুনু—বলল, 'ফটোগুলো দেখি,—ইনিই লতিকা চাকলাদার—দ্বিতীয় পক্ষ নাকি?'

—'হতে পারে।' আনন্দ সান্যাল মুচকি হেসে বললেন।—'সনৎবাবু আর প্রতীকবাবুও তো বেশ হ্যান্ডসাম দেখছি।'

—'কী ভাবছেন বলুন তো, মিঃ লাহিড়ী?'

—'আরে, না, না,—কিছু না। নিন ছবিগুলো রাখুন।' ফটোগুলো ফেরত দিল সুনু। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আনন্দবাবু, ভেবে দেখুন, যে খুন করেছে সে-ই হঠাৎ আগ বাড়িয়ে ইন্সপেক্টর শ্রুতিধর সামন্তর সঙ্গে কথা বলে তাকে সাক্ষী রাখতে যাবে কেন? আচ্ছা, সিটের রক্তের দাগের কী হল?'

—'প্রদোষবাবুরই রক্ত।' আনন্দবাবু জবাব দিলেন।

—'আচ্ছা, আমি চলি।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুনু। থানা থেকে বেরিয়ে অনীশ চৌধুরীর বাড়ির রাস্তা ধরল।

পাঁচ

অনীশ চৌধুরী তখন বাড়িতেই ছিলেন। সুনুকে দেখে এগিয়ে এলেন, ব্যগ্রভাবে ওর দু-হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, 'কী হল, মিঃ লাহিড়ী কোনো রাস্তা খুঁজে পেলেন মোতিকে বাঁচাবার? বলুন?'

—'এখনও অন্ধকারে,' ধীর স্বরে জবাব দিল সুনু, 'আচ্ছা, মিঃ চৌধুরী, প্রদোষবাবু বেশিরভাগ কার কার বাড়ি যেতেন?'

—'প্রায় সকলের বাড়িতেই তাঁর যাওয়া আসা ছিল।'

ঠিক এই সময় একটা বাচ্চা ছেলে কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে

এল। তার পরনে একটা গেঞ্জি আর একটা হাফ প্যান্ট। এগিয়ে এসে অনীশ চৌধুরীর হাত ধরল, তারপর জিজ্ঞাসা করল ধরা ধরা আদুরে গলায়, 'কাকু, আমার কুকুরটাকে দেখেছ? সাদা রঙের। নতুন তো, তাই কোনো বকলস পরানো হয়নি এখনো। বলো না কাকু, বাবা বলেছে না খুঁজে পেলে আমাকে আর কোনোদিন কুকুর এনে দেবে না। তুমি দেখোনি, কাকু?' এর পরই ছেলেটার চোখ পড়ল সুনুর উপর, ও চুপ করে গেল।

—'মিঃ লাহিড়ী,—' অব্যক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন অনীশ চৌধুরী, 'আমি বলিনি আপনাকে যে মোতি কখনোই মিথ্যা কথা বলছে না? এখন বিশ্বাস হল তো? আমি বলেছি আপনাকে যে কুকুর একটা থাকতেই হবে,—যেখানে হোক।'

সুনু ছেলেটার কাছ থেকে জানতে পারল ও নীচের তলায় থাকে, ওর কুকুর ঘটনার দিন বিকেলে হারিয়েছিল। নতুন বলে পথ চিনে বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি। কুকুরটার চেহারার বর্ণনা যা দিল তা মোতির সঙ্গে মিলে গেল হুবহু।

অনীশ চৌধুরীর কাঁধে হাত রাখল সুনু লাহিড়ী—দৃঢ়স্বরে বলল, 'মিঃ চৌধুরী, খুন যে করেছে সে আর একটু হলেই আপনার স্ত্রীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিল। আপনার স্ত্রীর পক্ষে এতদিনে একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই।'

ছেলেটার অর্থহীন দৃষ্টির সামনে দিয়ে অনীশ চৌধুরী ও সুনু লাহিড়ী বেরিয়ে গেল।

—'মিঃ চৌধুরী কোদালটা দিন, এদিকের আগাছাগুলো একটু বেশি আলগা মনে হচ্ছে।' সুনু একাগ্র চিত্তে মাটির দিকে চেয়েছিল। এর ঠিক হাত দশেক দূরেই কুকুরের মৃতদেহটা ফেলেছিল মোতি, মোতি অন্তত তাই বলেছে। অনীশ চৌধুরীর হাত থেকে কোদালটা নিয়ে গর্ত খুঁড়ে চলল সুনু। এক দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলেন অনীশ চৌধুরী।

হঠাৎ ওকী? সাদামতো কী একটা দেখা যাচ্ছে না? ওইতো, বেরিয়ে

পড়েছে একটা মৃত কুকুরের ধবধবে সাদা রঙের দেহ। ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে দেখতে লাগলেন অনীশ চৌধুরী।

—'সত্যিই, কুকুরটার গায়ে কোনো ক্ষতের চিহ্ন নেই,' সুনু মৃদু স্বরে বলল।

—'মোতি যে সত্যি কথাই বলবে, তা আমি জানতাম, মিঃ লাহিড়ী।' আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বললেন অনীশ চৌধুরী।

—'আপনাদের গাড়িটা পুলিশের জিম্মায় আছে; না, মিঃ চৌধুরি?'

—'হ্যাঁ।' জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী।

—'চলুন গাড়ির ভেতরটা একবার দেখতে হবে।'

—'চলুন।' কুকুরটার মৃতদেহ সঙ্গে করে দুজনে চলে গেলেন।

—'মিঃ চৌধুরী, দেখুন তো ভালো করে, গাড়ির ভেতর কোথাও কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন কিনা?'—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ির ভেতরটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে অনীশ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করল সুনু।

—'কই, না তো।' অনীশ চৌধুরীর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

—'ভালো করে দেখুন, মিঃ চৌধুরী। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ির মুখ কোনো দিকে? পুব দিকে না?'

—'ঠিকই বলেছেন, মিঃ লাহিড়ী।'

—'সম্প্রতি আপনার এই গাড়িটা কে কে চালিয়েছেন, মিঃ চৌধুরী?'

—'আমি আর মোতি।'

—'উহু, আরও একজন, যে প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়-এর লাশটা এই গাড়িতে করেই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাকেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

—'মিঃ লাহিড়ী,' অনীশ চৌধুরীর দৃষ্টি সানশেডের দিকে নিবদ্ধ, 'সানশেডটা অনেকখানি ওপরে ওঠানো মনে হচ্ছে।'

—'আপনার কথা যদি সত্যি হয় তবে বুঝতে হবে এটা কিছুটা অস্বাভাবিক;—চলুন একবার আনন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি,' এই বলে সুনু আর অনীশ চৌধুরী চলল থানা অফিসের দিকে।

পেছনে পড়ে রইল খুনের একমাত্র সাক্ষী, মোতি চৌধুরীর কালোরঙের শেভ্রলে গাড়িটা।

ছয়

আজ সকালটা কুয়াশায় ঢাকা। বিছানা থেকে উঠে হাই তুললেন অনীশ চৌধুরী। ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার, সাড়ে ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। তাড়াতাড়ি কোট-প্যান্ট পরে প্রস্তুত হয়ে নিলেন তিনি। কয়েক জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে প্রতীক চোখানির বাড়ি, পরে সনৎ সোম ও লতিকা চাকলাদারের কাছে। চটপট প্রস্তুত হয়ে নিলেন, তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অনীশ চৌধুরী। বাস স্টপে এসে বাস ধরলেন।

প্রথমে গেলেন চোখানির বাড়ি। চোখানি বাড়িতেই ছিল। বলল, 'হ্যালো চৌধুরী, কী ব্যাপার? হঠাৎ এই সকাল বেলায়?' কোনো উত্তর না দিয়ে অনীশ চৌধুরী ড্রইংরুমে ঢুকে একটা সোফায় কাত হয়ে বসলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললেন, 'প্রতীক, মোতি যে জেলে আছে তা জানো নিশ্চয়ই?'

প্রতীক চোখানি এতক্ষণ উৎকণ্ঠার দোলায় দুলছিল। এবার বলল, 'শুনলাম মিঃ চাকলাদারের কাছে। কী হয়েছে?'

—'হয়েছে অনেক কিছু,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'মিঃ লাহিড়ী, আই মিন, সুনু লাহিড়ী কিন্তু বলছেন যে মোতি নির্দোষ, সোজা কথায় তাকে কেউ ফাঁসিয়েছে। মিঃ লাহিড়ী সেটা জেনে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন যে ক্লাবে গিয়ে মোতি যখন কুকুর চাপা দেওয়ার ঘটনাটা বলে তখনই হত্যাকারীর মনে খুন করার এই অপূর্ব প্ল্যানটা আসে। সে তখন গুলি করে কাঁঠাল পেড়ে সেই কাঁঠালের ঘায়ে শিকার মারার মতো কাজটা সেরে ফেলে। অতি সুষ্ঠু, ঠান্ডা প্ল্যান। কাজ সেরে সে আবার ফিরে আসে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই বোধহয় মিঃ লাহিড়ী ধরে ফেলেছেন হত্যাকারীকে। ভেবে দেখ,

প্রতীক, মোতি গল্পটা বলার পর হত্যাকারী কোনো একটা কাজের অজুহাত দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় ক্লাবেই ছিলেন, হয়তো বাগানে। হত্যাকারী ভারী কোনো কিছু তুলে নিয়ে গেল। পেছন থেকে বসিয়ে দিল মিঃ চ্যাটার্জীর মাথায়, তারপর মোতিরই গাড়ি করে মৃতদেহটা নিয়ে, মোতি বর্ণিত জায়গায় গিয়ে ফেলে দেওয়া মিনিট আটেকের কাজ। কারণ জায়গাটা এত কাছে ক্লাব থেকে যে আর বলার নয়। এই জন্যই বলছি যে হত্যাকারী, ওই ঘরেই, অর্থাৎ যে ঘরে তোমরা তাস খেলছিলে সেই ঘরেই ছিল। সুতরাং...'

বাধা দিল প্রতীক চোখানি। বাঁকা চোখে চাইল অনীশ চৌধুরীর দিকে, তারপর বলল, 'অনীশ, তুমি কি শিগগিরই পুলিশে চাকরি নিচ্ছ? কিন্তু যাই বলো ভাই, তোমার কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে তোমাকে কথাগুলো কেউ পাখি পড়া করিয়ে দিয়েছে। তুমি যা বলবার তা স্পষ্টাস্পষ্টি বলো, অবশ্য তোমার বক্তব্য কী তা আমি জানি। তুমি আমাকেই ফাঁসাতে চাইছ, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব।—'

—'সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা অন্তত সম্ভব, চোখানি। যেমন মনে করো তুমি যে মাসে মাসে এক হাজার টাকা করে গত দু'মাস জমা দিয়েছ তা কোথায় পেলে? আমি জানি এর উত্তর তুমি দিতে পারবে না। এটাও জেনে রাখো কে তোমাকে ওই টাকা দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে তা আমি জানি।'

—'চুপ করো। এবার তোমাকে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলব, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। তোমার মতো বন্ধু আমার থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। যেখানে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ সেখানে বন্ধু বিচ্ছেদ হওয়াই ভালো। রাগে কাঁপতে লাগল প্রতীক চোখানি।

—'আমাকে ভুল বুঝো না, প্রতীক। আমি মিঃ লাহিড়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করব। তাই আমাকে, তারই কথামতো এই অপ্রিয় কাজ করতে হল,' অনুতাপে দগ্ধ কণ্ঠস্বর অনীশ চৌধুরীর, 'গুড বাই, চোখানি।'

—'বাই-ই।'

প্রতীক চোখানির বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিঃ চৌধুরী পা চালালেন

সনৎ সোমের বাড়ির দিকে। তার সঙ্গেও কিছু কথা আছে অনীশ চৌধুরীর।

সাত

ওর বাড়ি গিয়ে কলিংবেল টিপতেই সনৎ এসে দরজা খুলে দিল। অনীশ চৌধুরী ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, সনৎ হাসল তারপর বলল, 'এসো, চৌধুরী। ড্রইংরুমে এসে বসলেন অনীশ চৌধুরী। সনৎও উল্টো দিকের একটা সোফায় বসল। তারপর বলল, 'চৌধুরী, বিনা কারণে তুমি যে এসেছ তা মনে হয় না। এবার বলো তোমার উদ্দেশ্য কী?'

—'তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে, সনৎ। লতিকা দেবী কফি করতে যাবার পরই তুমি গিয়েছিলে বাথরুমে, তাই না?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু তোমার বাথরুমে দশ মিনিট লাগল কেন? দাঁড়াও, একবারে সব উত্তর দেবে। বাকি প্রশ্নগুলো সেরে ফেলি। তোমার উচ্চতা কত? আমার থেকেও বেশি? আর তুমি কী করো সেটা আজ পর্যন্ত সঠিক কেউ জানে না, সেটা বলতে হবে। সবশেষে, গত মাস কয়েকের মধ্যে এত টাকা তুমি পেলে কোত্থেকে, যার জন্য তোমাকে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হল?' অনীশ চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সনৎ সোমের দিকে।

—'তোমার প্রশ্নগুলো তোমার আওতার বাইরে হলেও তার উত্তরগুলো শুনে রাখো, চৌধুরী। ক্লাবের বাথরুমটা তুমি একবার ঘুরে আসবে, তারপর বলবে ক'মিনিট লাগা উচিত। আমার উচ্চতা তোমার চেয়ে ইঞ্চিছয়েক বেশি। আমি কী করি? তার উত্তর,—আমি ফ্ল্যাশ খেলি, রেস খেলি, জুয়া খেলি, শেয়ার মার্কেট, ফাটকা বাজারে ঘোরাঘুরি করি। যার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছি। আর কিছু জানবার আছে?' নির্বিকার, শান্তভাবে কথাগুলো বলল সনৎ।

তার ভঙ্গি দেখে কিছুটা চিন্তিত হলেন অনীশ চৌধুরী। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'যে যে জিনিসগুলো তোমার টাকা আমদানীর সোর্স, তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস বা সোর্স যোগ করলে বোধহয় ভালো করতে সনৎ। যাক, মিঃ লাহিড়ী আছেন, তিনিই না হয় তোমার হয়ে যোগ করে নেবেন, বা ধরে নেবে ওটা স্বাভাবিক ভাবেই তুমি উহ্য রেখেছ; যাক আমি চলি।' উঠে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী।

—'একটা কথা', সনৎ সোম বাধা দিলেন, 'মিঃ লাহিড়ীকে বলবে যে সনৎ সোম বাঁকা পথ পছন্দ করে না। আমার বুঝতে অসুবিধা হয়; হ্যাঁ?'

—'আজ সন্ধেবেলা ক্লাব ঘরে বসেই উনি জলের মতো তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন, এজন্য একটু ধৈর্য ধরে থাক। বাই—'

—'বাই—।'

'এরপর মিসেস লতিকা চাকলাদার', মনে মনেই বললেন অনীশ চৌধুরী।

আট

'লতিকা দেবী, আমি আগে আপনাকে খুনটা কী করে হল তা শোনাই, তারপর আপনার মতামত শুনব,' কথাগুলো বলছিলেন অনীশ চৌধুরী। তিনি আর লতিকা চাকলাদার মুখোমুখি দুটো সোফায় বসেছিলেন। মাঝখানে একটা ছোট গোল টেবিল। ঘরটা খুব সাধারণ অথচ সুন্দরভাবে সাজানো। বলাবাহুল্য, ঘরটি নরহরি চাকলাদারের ড্রইংরুম।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন মিঃ চৌধুরী, লতিকা দেবী, আপনি জানেন যে খুনটা মোতি করেনি; করেছে অন্য কেউ। আর করা হয়েছে ভারী কিছুর আঘাতে, মনে করুন এই স্ক্রু ড্রাইভারটা দিয়ে,' বলতে বলতে ক্যাবিনেট তৈরির একটা ভারী স্ক্রু ড্রাইভার তুলে নিলেন অনীশ চৌধুরী, 'প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন।

হত্যাকারী এই সময়ে এগিয়ে গেল। ভারী এই অস্ত্রটা সজোরে বসিয়ে দিল তাঁর মাথায়। তখন তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন। হত্যাকারী মৃতদেহটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে তুলল। কারণ হাতে সময় কম। প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়-এর মাথার রক্ত পড়ল গাড়ির পেছনের সিটে। হত্যাকারী মাথায় একটু বেশি লম্বা, তাই সানশেডটার জন্য রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল না। সেটা উঠিয়ে দিল খানিকটা। তারপর গাড়ি চালিয়ে, মোতি যেখানে মরা কুকুরটা ফেলেছে সেখানে গেল। মোতি আগেই ক্লাব ঘরে গল্পটা বলেছিল। তাই সেখানে গিয়ে কুকুরটা খুঁজে পেতে তার কোনোই অসুবিধা হল না। তারপর কুকুরটা অন্য জায়গায় পুঁতে, প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়-এর মৃতদেহটা তার পরিবর্তে ওখানে ফেলে রেখে চলে আসতে মিনিট দশেকের বেশি কারোরই লাগা উচিত নয়।

'তারপর ধীরে-সুস্থে এই অস্ত্রটা, মানে এই স্ক্রু ড্রাইভারটা ধুয়ে ফেলা কী এমন কঠিন কাজ? আপনিই বলুন? অতএব বোঝা যাচ্ছে যে হত্যাকারী আপনি বা প্রতীক চোখানি নয়। সুতরাং বাকি রইল কে?—সনৎ সোম—। অথচ আপনি জানেন যে সনৎ খুন করেনি, কারণ বেরিয়ে গিয়ে সে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল। সুতরাং বিশ্লেষণ বাঁকা পথে মোড় নিল। সনৎ খুব একটা লম্বাও নয় যে সে গাড়ি চালাতে গিয়ে সানশেডটা ওপরে ওঠাবে।

'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই রহস্য-যজ্ঞের হোতাটি কে? তিনি আপনারই পতিদেবতা শ্রীনরহরি চাকলাদার, যিনি কোর্টে কেস উঠলে মোতির হয়ে দাঁড়াবেন বলেছিলেন। মানে মোতিকে ভালোভাবেই ডোবাতেন। ওই দেখুন, আনন্দ সান্যাল ও সুনু লাহিড়ী আসছেন। আর বেশি ঝামেলা পোহাতে হল না।'

অনীশ চৌধুরী থামলেন।

হঠাৎ জানলা দিয়ে কে যেন বাগানে লাফিয়ে পড়ে দৌড়তে আরম্ভ করল, এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ধরা পড়ল ইন্সপেক্টর আনন্দ সান্যালের হাতে।

তিনি ব্যারিস্টার নরহরি চাকলাদার।

নয়

সেই দিনই সন্ধেবেলা। সুনু লাহিড়ী বলছিল আর সবাই শুনছিল। মুখে পাইপ গুজে সুনু বলতে আরম্ভ করল, 'মিঃ চৌধুরী, আপনি প্রথমেই আমার ধন্যবাদ নেবেন, আপনার চাতুর্যপূর্ণ কর্তব্য পালনের জন্য;' ঘরে উপস্থিত ইন্সপেক্টর আনন্দ সান্যাল, লতিকা চাকলাদার, প্রতীক চোখানি, সনৎ সোম, অনীশ চৌধুরী ও তার স্ত্রী মোতি চৌধুরী। সুনু আবার আরম্ভ করল, 'আমি দেখলাম সানশেডটা উপরে ওঠানো। মিঃ চৌধুরীর বাড়ি পুবমুখো বলে ওটার খুব ব্যবহার হতো। কিন্তু ওটা ওপরে ওঠালো কে? নিশ্চয়ই হত্যাকারী। আর সে নিশ্চয়ই মাথায় অনেক লম্বা। কে সে? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে উনি মিঃ নরহরি চাকলাদার। এ ছাড়া তার হাতের ছাপও পাওয়া গেছে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ।

'অনেকগুলো ঘটনার সমাপ্তি এই হত্যাকাণ্ডে। নরহরি চাকলাদার বেশি বয়সে যুবতী লতিকা চাকলাদারকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের আগে থেকেই প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতিকা চাকলাদারের জানাশুনা ছিল। বিয়ের পর মিসেস চাকলাদার খুশি হলেন না নরহরি চাকলাদারকে নিয়ে। কারণ তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মিসেস চাকলাদার। নরহরি চাকলাদার লতিকা চাকলাদারের কোনো স্ক্যান্ডালের কথা জানতেন। যাহোক, বিয়ের পর প্রদোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতিকা চাকলাদারের মেলামেশা অনেক বেড়ে গেলে সেটা জানতে পেরেছিলেন সনৎ সোম,—হঠাৎই বলতে পারেন। তিনি গোপনে দেখা করলেন প্রদোষবাবুর সঙ্গে, বললেন, টাকা দাও নয়তো সব ফাঁস করে দেব। প্রদোষবাবু লজ্জার ভয়ে, মুখ বন্ধ করবার জন্য টাকা দিতে লাগলেন। সোজা কথায় সনৎ সোম ব্ল্যাকমেল করতে লাগলেন প্রদোষবাবুকে।

'ওদিকে সনৎবাবু দেখা করলেন লতিকা চাকলাদারের সঙ্গে। তিনিও ব্যাপারটা নরহরি চাকলাদারের কানে উঠবে ভেবে, ভয়ে ওকে টাকা দিতে লাগলেন। সনৎবাবু সেদিন মিঃ চৌধুরী, আমার নির্দেশ মতোই আপনার, প্রতীকবাবুর ও মিসেস চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করেন এবং

আমারই শেখানো কথাগুলো বলেন। আপনার টাকা ইনকামের সোর্সগুলোর সঙ্গে যেটা যুক্ত হওয়া উচিত তা হল ব্ল্যাকমেলিং। সনৎবাবু সেদিন উঠে বাথরুমে যাননি, গিয়েছিলেন মিসেস চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করতে, তাই না মিসেস চাকলাদার?'

মিসেস চাকলাদারের দিকে ফিরল সুনু, উনি মাথা নাড়লেন।

সুনু আবার শুরু করল, 'হঠাৎই নরহরি চাকলাদার, মিসেসের ব্যাপারটা জানতে পারলেন, একদিন দেখতেও পেলেন। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে গেল। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুযোগ এসে গেল। সেটা সুন্দরভাবে কাজে লাগালেন। তারপর তো জানেনেই। হত্যার হাতিয়ার? হ্যাঁ, ওই স্ক্রু ড্রাইভারটাই।

'যাক, আমি উঠি, মিঃ সান্যাল; একটা কথা, সনৎ সোমের আসল পরিচয়টা দেওয়া হল না। উনি হলেন স্বনামখ্যাত ব্ল্যাকমেলার ক্যাটি চৌহান। আপনারা বোধহয় ওর নাম শুনে থাকবেন।' সুনু থামল।

আনন্দ সান্যাল এগিয়ে গেলেন সনৎ সোমের দিকে, বললেন, 'আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে, মিঃ সোম।'

ঠিক এই সময় লাফিয়ে উঠলেন অনীশ চৌধুরী, বললেন, 'মিঃ লাহিড়ী, শুনেছি আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আপনি সেদিন যে আইডেনটিটি কার্ডটি দেখালেন ওটি কার?'

—'আমারও সেই প্রশ্ন, মিঃ লাহিড়ী,' বলল মোতি।

সুনু উত্তর দিল, 'আপনিই বলুন মিসেস চৌধুরী, ওটা না দেখালে আমাকে মিঃ চৌধুরী ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন কিনা, অত রাতে গিয়ে ঝামেলা করার জন্য? তবে শুনুন, ওটা ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লাবের পুরোনো মেম্বারশিপ কার্ড। উত্তেজনায় আপনি ভালো করে খেয়াল করেননি।'

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুনু লাহিড়ী, সঙ্গে অনীশ চৌধুরী আর মোতি চৌধুরী।

চুপচাপ বসে রইলেন লতিকা চাকলাদার, তার চোখে সর্বহারার ভঙ্গি।

উপন্যাসোপম কাহিনি



করাল ঈগল

Arajakata Exclusive

১

'ডিটেকশন' ক্লাব-এর পুরোপুরি পাঁচজন সভ্যই উপস্থিত ছিলেন। ঘরে একটা সাধারণ বাল্ব জ্বলছে। জানলাগুলো বন্ধ। শীতের অল্প আমেজ আছে হাওয়ায়। তবু মাথার ওপর পাখা ঘুরছে একটা। ঘরে একটা গোল টেবিলের চারদিকে গোটাছয়েক চেয়ার। একটা ফুলদানি টেবিলের ওপর—তাতে কতগুলো রজনীগন্ধার স্টিক। এছাড়াও আছে একটা ফাইল আর কিছু আলগা কাগজপত্র—একটা পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেওয়া।

অনীশ চৌধুরী দাঁড়িয়েছিলেন ফাইলের কাছে। মুখে পাইপ। তার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ তার সঙ্গে আপনারা পরিচিত। এছাড়াও যারা ছিলেন তারা হলেন সুনু লাহিড়ী, মোতি চৌধুরী, অলোক মুখার্জী ও চন্দন দেবনাথ। চন্দন দেবনাথ পরিচয়ের দাবি রাখেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ চেহারার মানুষ। স্বাস্থ্য সাধারণ, চোখের চশমার উপর সবসময় একজোড়া সানগ্লাস লাগিয়ে রাখেন। পাজামা-পাঞ্জাবি ছাড়া তাকে কেউ অন্য পোশাকে বেরোতে দেখেনি। তিনি ফ্ল্যাশ, পোকার, রামি—ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তাসের জুয়া খেলেন নিয়মিত—একেবারে সিদ্ধহস্ত। টাকাপয়সা কম পড়লেই কোনো জুয়ার আড্ডায় ঢুকে পূরণ করে নিয়ে তারপর বেরোন। এমনকী বাসভাড়ার পয়সা কম পড়লেও সেই একই উপায় নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

প্রায় প্রত্যেকটি জুয়ার আড্ডাতে সকলে তাকে চেনে। তার একটি গুণ আছে—তা হল অবসর সময়ে বা কোনো রহস্যের মীমাংসা না করতে পারলে, তিনি একমনে অঙ্ক করেন। তার ধারণা তাতে মাথার গ্রে সেলগুলোর উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়ে। অপরাধের বহু প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি সাধারণত মেথড অফ এলিমিনেশনটাই বেশি পছন্দ করেন। এইজন্য

সকলে তাকে বলে মিথ্যান্বেষী চন্দন দেবনাথ। তিনি এতে মোটেই আপত্তি করেন না। বরং বলেন, 'অনীশদা, এবার নেমপ্লেট লাগাব—মিথ্যান্বেষী চন্দন দেবনাথ। কেমন হবে বলুন তো?'

তিনি পকেট থেকে চিরুনি বার করে তার কদম ছাঁট চুলের মধ্যে চালাচ্ছিলেন। এমন সময় অনীশ চৌধুরী বললেন, 'মিঃ লাহিড়ী, মিঃ মুখার্জী, মোতি, চন্দন, তোমরা সব বসে পড়। আজ অনেক কথা আছে।'

সকলে বসে পড়লেন এক-একটা চেয়ারে। অনীশ চৌধুরী গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর এসে বসলেন নিজের জায়গায়। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আজ গল্পটা শুরু করার আগে একটা প্রশ্ন করি।...' সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন অনীশ চৌধুরীর দিকে। অনীশ চৌধুরী বলতে শুরু করলেন, 'একজন মানুষের পায়ের ছাপ—পাশে পাশে একটা গোল দাগ। পায়ের ছাপ অগভীর, দু-দুটো পরপর ছাপের মধ্যের দূরত্ব খুব বেশি নয়—দেড় ফুট। এর থেকে আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব?'

'এমন কিছু কঠিন নয়।' মৃদুস্বরে বললেন চন্দন দেবনাথ।

'আমি বোধহয় বলতে পারব।' বললেন মোতি চৌধুরী, 'লোকটির পাতলা চেহারা, উচ্চতা মাঝারি—ডানহাতে লাঠি নিয়ে হাঁটেন তিনি—যদি অবশ্য গোল দাগটা ডানদিকে থাকে।'

'অন্য কিছু যে হতে পারে না এমন নয়।' বললেন চন্দন দেবনাথ, 'মাটি যদি কম ভিজে থাকে তবে মোটা লোকের ছাপও অগভীর হবে। আর যখন ওয়াকিং স্টিক হাতে কোনো লোক হাঁটে, তবে সে যদি লম্বাও হয়—ধীরে হাঁটার জন্য পায়ের ছাপের মধ্যেকার দূরত্ব দেড় ফুটরই কাছাকাছি হবে—তাই না?'

'আমি স্বাভাবিক সম্ভাবনার কথা ভেবেই জবাব দিয়েছি।' রাগত কণ্ঠস্বর মোতি চৌধুরীর।

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন চন্দন দেবনাথ, বললেন, 'ও হো ঠিকই তো—আমারই ভুল হয়েছে।'

'মিথ্যান্বেষী, তোমার ভুল হয়নি। তবে মোতি যেটা বলছে, সেটাই

স্বাভাবিক।' বললেন অনীশ চৌধুরী, 'এখন মূল গল্পে ফিরে আসা যাক। বেশিদিনের কথা নয়। ঘটনাস্থল একটা পাহাড়ি জায়গা। বিশেষ কারণে নামটা গোপন করতে হচ্ছে আমাকে। খাদের ধারের রাস্তা থেকে মাইলটাক গেলে একটা বন। বন বলতে শিশু, শাল ইত্যাদি গাছে ভর্তি। গাছের শুকনো ঝরাপাতায় বনের মাটি প্রায় সময়েই ঢাকা থাকে। বনের মধ্যে কিছুদূর গেলেই চোখে পড়বে পাঁচিল। হ্যাঁ—পাঁচিলই বলতে হবে, কারণ দূর থেকে শুধুমাত্র পাঁচিলটাই দৃষ্টিগোচর হয়। কালো এবড়ো খেবড়ো পাথরের পাঁচিল। একটু চেষ্টা করলে বোধহয় গা বেয়ে ওঠা সম্ভব। আরও এগোলে চোখে পড়বে মাঝারি সাইজের একটা দরজা। লোহার দরজা। দরজার একটা বিশেষত্ব আছে। তা হল ওটা ওপর নীচে স্লাইড করা যায়। গেট দিয়ে ঢুকলে দূরেই চোখে পড়বে ছবির মতো একতলা সাদা বাড়ি। বাড়িটা ছাড়া ভেতরে প্রায় সমস্ত জায়গাই বড় বড় গাছে অন্ধকার। লোহার গেট থেকে সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে বাড়ির দিকে। রাস্তার দুধারে সাদা রং করা ইট কাত করে বসানো। পাঁচিল ঘেরা জায়গায় ক্ষেত্র-পরিমাপ প্রায় তিন বিঘে। পাঁচিলটা প্রায় ন'ফুট উঁচু।

গল্পটা আমি বিভিন্নজনের কাছে শুনে নিজে ঘটনা অনুযায়ী সাজিয়েছি। সেদিন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের একপাশে পূর্ণিমার চাঁদ। রাস্তাতে পড়ে থাকা গাছের পাতাগুলো ভিজে গেছে। গল্পের দৃশ্য শুরু হল।...

২

একটু তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিলেন জগদীশ মোদক। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, একটু কষ্ট করে দেখলেন, রাত ন'টা বেজে পঁচিশ মিনিট।

জগদীশ মোদকের বিশাল চেহারা। লম্বায় তিনি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। এক হাতে ওয়াকিং স্টিক, অন্য হাতে ড্রাইসেলের টর্চ। তার পায়ে ভারী রবার সোলের বুট, গায়ে বর্ষাতি।

তার গায়ের বর্ষাতি থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছিল। অন্ধকারে শুধুমাত্র আলোকিত অংশটাই ঠাহর হচ্ছিল। গাছের ঝরা পাতাগুলো ভিজে থাকায় চলার সময় কোনো শব্দ হচ্ছিল না। ক্রমে দূরে দৃষ্টিগোচর হল পাঁচিল ঘেরা জায়গাটা। পাথরের পাঁচিলটা একটু নীলচে দেখাচ্ছিল ম্রিয়মান চাঁদের আলোয়। আকাশের মেঘ করা দিকটা তখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছলেন জগদীশ মোদক। লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালেন। কাউকে নজরে পড়ল না। তখন তিনি পাথরের দেওয়ালে গাঁথা কলিংবেলটা টিপলেন। কর্কশ আওয়াজ উঠল একটা, অনেকটা প্যাঁচার ডাকের মতো।

ভেতরের টানা কাঁচা রাস্তা ধরে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ধীরে ধীরে তার মুখ, হাত, পা দৃষ্টিগোচর হল। লোকটির একটা পা খোঁড়া, একটু ভাঁজ করা। সে শুধুমাত্র একটা লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে এল। তার সারা মুখময় বসন্তের দাগ। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে; বোধহয় বসন্তেই।

বাকি চোখটা দিয়ে সে ভালোভাবে তাকাল জগদীশ মোদকের দিকে, তারপর দরজায় চাবি লাগিয়ে তালাটা খুলল। দরজাটা ওপরে ঠেলে তুললেন জগদীশ মোদক নিজেই। তারপর নীচু হয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ছেড়ে দিলেন। দড়াম করে পড়ল দরজাটা,—শব্দের রেশটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন জগদীশ মোদক, 'শিবরাম তোর মাইজী ফিরেছে?'

শিবরাম ঘাড় কাত করে জানাল, হ্যাঁ। শিবরাম বোবা—কিন্তু কানে শুনতে পায় ভালোভাবেই। এটাই বোধহয় জগদীশ মোদকের অসুবিধে। তবে, শিবরাম লিখতে জানে অল্প।

জগদীশ মোদক আর দাঁড়ালেন না, হাঁটা দিলেন সরু কাঁচা পথ ধরে। পথের দু'ধারে সাদা রং করা ইট কাত করে বসানো। তিনি শুনতে পেলেন পেছনের দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ। শিবরাম দরজায় তালা দিচ্ছে।

তিনি ভাবছিলেন, সুনীতা ফিরে এসেছে এত তাড়াতাড়ি? হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন জগদীশ মোদক।

দরজার একপাশে জুতো জোড়া খুলে রাখলেন তিনি। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা মোটামুটিভাবে সাজানো গোছানো। ঘরে ঢুকেই বাঁ-দিকে টুপি রাখার স্ট্যান্ড; একটু দূরে হ্যাঙার, তাতে কয়েকটা জামা ঝোলানো। ঘরের ডানদিকে আলমারি—তার পাশে রেফ্রিজারেটর। ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে একটা ছোট গোল টেবিল—তার ওপর কয়েকটা ইংরাজি ম্যাগাজিন। টেবিলের চারিদিকে সাজানো তিনটে সোফা।

জগদীশ মোদক টুপি খুলে রাখলেন। জল ঝরে পড়া বর্ষাতিটাকে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলেন। পকেট থেকে সিগারেট বার করে মুখে দিলেন—তারপর সুদৃশ্য লাইটার জ্বালিয়ে সেটাতে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে বসলেন একটা সোফায়; লাঠিটাকে টেবিলের ওপর রাখলেন তারপর একটা ম্যাগাজিন তুলে দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ কী মনে পড়তেই উঠে দাঁড়ালেন জগদীশ। এগিয়ে গেলেন আলমারিটার কাছে। পকেটে হাত গলিয়ে চাবি বার করে আলমারির দরজা খুললেন। ভারী কাঠের পাল্লাদুটো সরাতেই নজরে এল তাকভর্তি সারি সারি বোতল। বোতলগুলোতে তরল পদার্থ রাখা আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। বাথটাবের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। একটু নতুন ধরনে তৈরি বাথটাবটা। বাথরুমের মেঝে থেকে নিচুতে ওটা ফিট করা,—দুটো সিঁড়ি নেমে তারপর জলে নামতে হয়। বাথটাবটা বাথরুমের ডান দিকের দেওয়ালের প্রায় পাশ ঘেঁষে ফিট করা।

দেওয়াল আর বাথটাবের মধ্যের অংশটার ওপর একটা লম্বা, ভারী লোহার জাল দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। সেটা বিপরীত দিকের দেওয়ালের ফাঁকা জানলার মতো অংশে বসানো হবে। জানলাটা লম্বা ধরনের আর মেঝে থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। একটু স্বস্তির ভাব দেখা গেল জগদীশ মোদকের মুখমণ্ডলে। তিনি ফিরে এলেন বসবার ঘরে।

আর ঠিক তখনই তার চোখ গেল ফ্রিজের ওপর। এক বাক্স সন্দেশ রাখা আছে সেখানে। মৃদু হাসলেন জগদীশ মোদক, সুনীতার ছেলেমানুষি এখনও গেল না; এখনও ও বাচ্চাদের মতো সন্দেশ খেতে ভালোবাসে।

একটা সোফায় বসে পড়ে আগের পত্রিকাটা নিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এমন সময় তাঁর পায়ের কাছে একজনের ছায়া পড়ল। চমকে ফিরে তাকালেন জগদীশ। সুনীতা, মানে তাঁর স্ত্রী সুনীতা মোদক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। মুখের প্রসাধন এখনও পুরোপুরি লেগে রয়েছে।

সুনীতা মোদকের বয়স আনুমানিক বত্রিশ বৎসর। গালদুটো তোবড়ানো, চোখের নীচের কালিকে হালকা পাউডারের প্রলেপের সাহায্যে অদৃশ্য করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। চেহারা স্লিম; একটা দামি ফিকে সবুজ শাড়ি পরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। হ্যাট স্ট্যান্ডের পাশে রাখা কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে খেলেন। তারপর এগিয়ে এসে বসলেন একটা সোফায়, জগদীশের মুখোমুখি একেবারে।

'কী ব্যাপার? আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?' প্রশ্ন করে ভুরু তুলে চাইলেন জগদীশ মোদক।

সোজা পথে গেলেন না মিসেস সুনীতা মোদক। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আমিও তো তোমাকে ওই একই কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাই না?'

'আমি কি আইন বহির্ভূত কিছু জিজ্ঞাসা করে ফেলেছি, ডার্লিং?'

'আমার পার্টি ভালো লাগছিল না, তাই চলে এসেছি।' থতমত ভাবটা কাটিয়ে উঠে জবাব দেন সুনীতা।

আচমকা হেসে উঠলেন জগদীশ মোদক। বললেন, 'ও—হো—তাই বলো। যাক তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। তুমি খেয়ে নাও—ফ্রিজে রাখা আছে।' ঘর ত্যাগ করলেন সুনীতা মোদক।

জগদীশ মোদকের চোখে খেলে গেল বিচিত্র হাসি—রাগ? কদ্দিন আর?...কোনোও ফল হবে না। সোসাইটি লেডি শ্রীমতী সুনীতা মোদক,—আজ ককটেল পার্টি, কাল ম্যারেজ আনিভার্সারি—পরশু এটা—তরশু ওটা, এই নিয়েই মেতে আছেন তিনি। এখানকার উইমেনস ক্লাব

অপেক্ষাকৃত কম।

কিছুদূর চালানোর পর তিনি একটা সুদৃশ্য বাড়ির কাছে এসে ব্রেক চেপে গাড়ি থামালেন। দরজা লক করে সিধে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। একটা ছোট দোতলা বাড়ি এটা। মস মস শব্দে সিঁড়ি অতিক্রম করে একটা বন্ধ দরজার গায়ে নক করলেন—টক—টক—টক। ভেতর থেকে উত্তর এল নারী কণ্ঠে, 'কে?'

'আমি, দরজা খোলো।' উত্তর দিলেন জগদীশ মোদক। সম্মুখের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। দেখা দিল এক নারীমূর্তি। তার পরনে একটা সিল্কের শাড়ি। কপালের কুঙ্কুমের বড় গোল টিপ। কানে সুদৃশ্য পাথরবসানো দুল। মাথায় একটা বিরাট খোঁপা। মহিলার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। ভদ্রমহিলা জগদীশ মোদককে সাদর আহ্বান জানাল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

ঘরের ভেতর পা বাড়ালেন জগদীশ মোদক।

ঘরটা অপূর্ব সাজানো। সর্বত্রই সুরুচির পরিচয় দৃশ্যমান। এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় গা এলিয়ে বসলেন জগদীশ মোদক। ভদ্রমহিলা উঠে গিয়ে ইলেকট্রিক পাখাটার সুইচ অন করে দিল; তারপর এসে অপর একটি সোফায় আসন গ্রহণ করল। জগদীশ মোদক চাপা হাসি হাসলেন। বললেন, 'এত সেজেছ। কী ব্যাপার?'

'কই আর সেজেছি! এমনিই।' মহিলার ডান গালের জড়ুলটা নড়ল একটু।

'কোথাও বেরোচ্ছিলে বুঝি?' সন্দেহমুক্ত হতে চান জগদীশ মোদক।

'কোথাও না। আশা করছিলাম যে তুমি আসবে—যাকগে, তোমার কী খবর বলো।'

'আমার খবর ভালো নয়।'

'অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে নাকি?'

'যা ঘটেছে তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না লতা—বরং অতিমাত্রায় স্বাভাবিক। আমার স্ত্রী, মানে সুনীতা বোধহয় সব জানতে পেরেছে। অন্তত কাল রাতে ওর কথা শুনে তাই মনে হল।'

'আর যাই বলো জগদীশ, তোমার বউ কিন্তু ভারি বোকা; তুমিই বলো আরও আগে বোঝা উচিত ছিল না এটা? তোমার হাতেররেখার

জোর আছে যে—তিনি ব্যাপারটা পরে বুঝেছেন।'

'লতা, এটাকে হাল্কাভাবে নিও না।' সিরিয়াসভাবে বললেন জগদীশ মোদক, 'তুমি জানো না, ও ইচ্ছে করলে আমাকে ওর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে।'

'অনেক টাকা বুঝি? তবে তো খুবই মুশকিলের ব্যাপার! এমন করা যায় না যে সম্পত্তি তুমিই পাবে—আর কেউ না?' বাঁকা হাসি হাসল লতা বোস।

'হেসো না বোকার মতো!' গর্জে উঠলেন জগদীশ, 'তুমি জানো যে ওখানকার লোক আমার উপর সন্দেহগ্রস্ত? আমার ব্যবহার ওদের কাছে রহস্যজনক? আমি কী করি, আমার বাড়ির চারিদিক কেনই বা পাথরের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সব জানবার জন্য ওরা আগ্রহী!'

'তবে তাদের সব খুলে বলো না কেন?' সহজভাবেই প্রশ্ন করল লতা।

'উপায় নেই—উপায় নেই লতা! তোমাকে আমি কী করে বোঝাব?'

'আমাকে বলতে আপত্তি আছে?' জগদীশের সোফার হাতলে এসে বসল লতা। তার পিঠে হাত রাখল, বলল, 'জগদীশ, তুমি আমাকে সব ঘটনা খুলে বলো; মনের মধ্যে চেপে রেখে নিজে কষ্ট পেও না। আমাকেও কি তুমি বিশ্বাস করো না?'

'বিশ্বাস করি তোমাকে।' ডুকরে উঠলেন জগদীশ। দু-হাতের ফাঁকে মাথা গুঁজে দিলেন; অবসন্ন, পরিশ্রান্ত পথিকের মতো, হতাশায় আচ্ছন্নের মতো মাথা নিচু করে বসে রইলেন। লতা বোস তার ঘাড়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকল। মুখ তুললেন জগদীশ মোদক, বিকৃতস্বরে বলতে শুরু করলেন, 'লতা, সে বেশ কিছুদিন আগেকার কথা, আমি ব্যবসা করতাম...দিল্লিতে—

৪

জগদীশ মোদকের ছাপাখানা, তবে তার নাম এখন সুরেশ দাস। বিশেষ কারণেই এই ছদ্মনামটা নিয়েছেন তিনি। তার ছাপাখানায় দুটো শিফটে

কাজ হয় সকাল এবং রাত, এই দুই সময়ে। তার ছাপাখানা এর মধ্যেই বেশ নাম করেছে। তার একজন ম্যানেজার আছে, তার নাম আডবানি। বয়স প্রায় চব্বিশের কোঠায়। মুখে শ্রী আছে, রং অত ফরসা নয়, খুব করিৎকর্মা ছেলে।

একদিন রাত্রিবেলা। অফিসরুমে বসে আছেন জগদীশ মোদক—ওরফে সুরেশ দাস। রাত সাড়ে বারোটা। রাতের কাজের সময় প্রায়ই উপস্থিত থাকেন তিনি। এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল রমেশ আডবানি। দেখে খুবই উত্তেজিত মনে হল। এসেই টেবিলের অপর দিকে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'স্যার, আপনি নাকি রাতে আপনার ছাপাখানায় টাকা ছাপেন?'

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন জগদীশ মোদক। ও জানল কেমন করে? আসল জায়গায় তো ওর ঢোকার কথা নয়! নিশ্চয়ই ও ঢুকেছে। বললেন, 'তোমাকে কে বলল?' মুখে অজ্ঞতার ছাপ আনলেন তিনি।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি; আপনি কি অস্বীকার করেন?' ওর চোখ-মুখ লাল।

'রমেশ, তোমাকে আমি মাইনে দিই নিশ্চয়ই?' শীতলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জগদীশ।

'নিশ্চয়ই দেন—একটু বেশিই দেন বলতে হবে!' ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ তার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ—বেশিই দিই—দু'হাজার। তুমি যদি না চাও তবে যেতে পারো।'

'হ্যাঁ—যাব—তবে বাড়ি নয়,—থানায়! পুলিশে জানাব আমি। বলব আপনি এখানে জাল নোট ছাপেন।' টেবিলে দড়াম করে একটা ঘুঁষি মারল আডবানি।

'সেটা কি খুব একটা নিরাপদ কাজ হবে, রমেশ?' অবুঝের মতো জানতে চাইলেন তিনি।

'সেটা আমি বুঝব।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রমেশ। ডাকলেন জগদীশ, 'দাঁড়াও, কত টাকা চাও তুমি?'

'আপনার এই টাকার মুখে আমি থুথু দিই!'

চট করে সামনের ড্রয়ারটা থেকে রিভলভারটা টেনে বার করলেন

জগদীশ। রমেশের দিকে উঁচিয়ে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,' এটাতে সাইলেন্সার লাগানো আছে, আডবানি। দরজাটা বন্ধ করে দাও, নয়তো...'

মন্ত্রের মতো কাজ হল। দরজা বন্ধ করে দিল রমেশ। সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলেন জগদীশ মোদক। 'ফট' করে একটা শব্দ হল শুধু। রমেশ আডবানি ঘুরে ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয়।

হেসে এগিয়ে এলেন জগদীশ মোদক, মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী যুবক, তোমার কপালে এই লেখা ছিল!'

মৃতদেহটাকে চটপট একটা আলমারিতে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করলেন। তারপর বসে গেলেন মেঝে থেকে রক্ত মুছতে।

রক্ত মোছা শেষ হলে তাকালেন ঘড়ির দিকে। রাত একটা বাজে। আর মাত্র এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পরেই ছাপাখানার ছুটি। উঠে দাঁড়ালেন জগদীশ মোদক।

ঘণ্টাদেড়েক বাদে জগদীশ মোদককে দেখা গেল অফিস রুম থেকে বেরোতে, সঙ্গে রমেশ আডবানির মৃতদেহটা। সেটাকে মেঝের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলছেন তিনি। অদূরেই দেখা গেল একটা বিশাল হাইড্রলিক প্রেস। প্লেটের ওপর মৃতদেহটা রেখে লিভারে চাপ দিলেন জগদীশ মোদক। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো লোহার ব্লকের মাঝে মৃতদেহটা চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে গেল। জগদীশ মোদক ব্লক দুটো জোড়া অবস্থাতেই রেখে সরে পড়লেন।

দিল্লি থেকে উধাও হল সুরেশ দাস।...কলকাতায় আবির্ভূত হলেন জগদীশ মোদক। কিন্তু জগদীশ মোদক সতর্ক ছিলেন অতি মাত্রায়। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন একজনকে, সে হিরণ্ময় চতুর্বেদী। লোকটা জগদীশ মোদকের আসল পরিচয় জানত। তাই একদিন চিঠি দিল ঃ

স্যার,

আমি আপনার...আই মিন সুরেশ দাসের—আসল পরিচয় জানি। যে রমেশ আডবানিকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য দায়ী, সে হল জগদীশ মোদক। আপনার ফটো এক কপি আমার কাছে আছে। আর দিল্লির পুলিশ এখনও আডবানির

হত্যাকারীকে খুঁজছে। আপনার সঙ্গে কবে দেখা করব কাইন্ডলি জানাবেন।—হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

পুনশ্চঃ আডবানির বডি পোস্টমর্টেম করা যায়নি।

চিঠি পেয়ে পরিস্থিতির জটিলতা বুঝতে চেষ্টা করলেন জগদীশ মোদক। হিরণ্ময় চতুর্বেদী,...কে? নাঃ, তার পরিচিত কেউ নয়! তবে কীভাবে তার ছবি বাগাল লোকটা। ভেবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। লোকটা তার পরিচয় জানলেও ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই—কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছে ওই ফটোটা।

জগদীশ মোদক বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন, বললেন, 'ম্যানেজার সাবকে বলো বিল করে দিতে। আমি এ হোটেল ছেড়ে দেব।'

৫

কলকাতায় এবার তিনি অন্য ব্যবসা ফাঁদবার কথা চিন্তা করলেন। তবে জগদীশ মোদক কাঁচা কাজ করেননি। দিল্লির ইনকামের প্রায় সমস্ত টাকাটাই কলকাতায় নিজের অ্যাকাউন্টে নিজের নামে জমা দিয়েছিলেন। এখন কিছু টাকা তুলে এনে অন্য জায়গায় একটা নোংরা অখ্যাত হোটেলে ঘর ভাড়া নিলেন। এমন সময় খুব আশ্চর্যজনকভাবেই এল দ্বিতীয় পত্র। লেখক সেই আদি ও অকৃত্রিম হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

স্যার,

লোকে বলে আমি টেলিপ্যাথি জানি। হতে পারে, তবে আমি নিরামিষাশী নই, গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই, আমি ছোটবেলায় খুব ভালো লুকোচুরি খেলতাম। এনিওয়ে, আমি আগামীকাল রাত আটটার সময় আপনার ওই বিশুদ্ধ বাঙালি হোটেলে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ভয় পাবেন না—কেমন?—বিনয়াবনত—হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

জগদীশ মোদক চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললেন। কানে বাজতে লাগল রাত আটটা—রাত আটটা। কী—কী করতে পারে লোকটা—ব্ল্যাকমেলিং?

হাসলেন তিনি। জগদীশ মোদককে ব্ল্যাকমেল করতে পারে এমন ব্যক্তি এখন মাতৃগর্ভে। একটাই পথ আছে লোকটার। ভালোয় ভালোয় ফটোটা বিক্রি যদি না করে—জগদীশ মোদকের মুখ ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠল। বাঁ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করলেন রিভলভার—সাইলেন্সার লাগানো।

বৃথা কালক্ষেপ পছন্দ করেন না হিরণ্ময় চতুর্বেদী। বিয়ের পর থেকে ঘর ছাড়া তিনি। পরে শুনেছেন একটা সন্তান রেখে মারা গেছে হতভাগা বউটা। না, চোখের জল ফেলেননি হিরণ্ময়। শুধুমাত্র ভাগ্যের সঙ্গে লড়ে দেখতে চেয়েছেন। আজ তার এই অবস্থা। তিনি প্রফেশনাল ব্ল্যাকমেলার। চাকরি বাকরি করে জীবনের সোজা পথে চলতে গিয়ে অমোঘ নিয়তির মতো সোজা পথ চোখের সামনে বাঁকা হয়ে গেছে। তার জন্য হতাশ হয়ে কেঁদে যে লাভ নেই তা তিনি শুনেছিলেন যে তার মেয়েটি—একমাত্র মেয়েটি একজনকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে। খুবই আনন্দের কথা তার পক্ষে।

একটা রিভলভার পকেটে পুরে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। সোয়া সাতটা প্রায়। রিভলভার তিনি নিতেন না। তবে নিচ্ছেন শুধু আত্মরক্ষার জন্য, কারণ জগদীশ মোদককে তিনি মোটামুটি চেনেন। তার নিজেরও একজন বিজনেস পার্টনার দরকার।

পথে পা বাড়ালেন হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

রাত সোয়া আটটা। জগদীশ মোদকের ঘরের দরজায় আবির্ভূত হলেন হিরণ্ময় চতুর্বেদী। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন জগদীশ মোদক। সাধারণ একহারা চেহারা, একটা পা বোধহয় অন্যটার তুলনায় ছোট। মাথায় একটা

কাপড়ের ক্যাপ, গলায় জড়ানো লাল স্কার্ফ। মুখ খুললেন জগদীশ, 'আমি—মানে ঠিক আপনাকে...'

'আমিই হিরণ্ময় চতুর্বেদী।' বাধা দিলেন হিরণ্ময়। সুন্দর মুখে একটুও ভাঁজ পড়ল না।

'ওঃ, তাই বলুন। কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলবেন কী?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সেটা বলবার জন্যই তো আমার এতদূর ঠেঙিয়ে আসা।'

বোকা বোকা হাসি হাসলেন জগদীশ। বললেন, 'চায়ে আপত্তি আছে?'

'ঘোরতর।'

'কফিতে?'

'সেখানেও সেই এক কথা।' দাঁত বার করে হাসলেন হিরণ্ময়। জগদীশ মোদকও অকারণে হাসলেন। চতুর্বেদী বললেন, 'মক্কেলের বাড়িতে গিয়ে কিছু খাওয়া আমাদের—আই মিন ব্ল্যাকমেলারদের নিষেধ আছে।...এবার কাজের কথায় আসি—আমি একজন বিজনেস পার্টনার চাই। দ্যাট ইজ আপনি। আপনার মতো লোকই চাই আমি। অলওয়েজ হাফ হাফ শেয়ার। রাজি?'

একটু ভাবলেন জগদীশ মোদক। লোকটা ধোঁকা দিচ্ছে না তো।

'রাজি না হলে রমেশ আডবানির হত্যাকারী সুরেশ দাসকে পুলিশ ধরবে—' নিজের খেয়ালেই বললেন হিরণ্ময় চতুর্বেদী। সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন জগদীশ মোদক। বললেন, 'রাজি।'

'দ্যাটস গুড।' হেসে সিগারেট ধরালেন চতুর্বেদী।

তারপর থেকে দুজনে শুরু করলেন ব্ল্যাকমেলিং। জগদীশ মোদক পদ্ধতি বাতলে দেন আর হিরণ্ময় ব্ল্যাকমেল করেন। বিচিত্র সব উপায়ে। পুলিশ চেষ্টা করেও কাউকে ধরতে পারে না। জগদীশ মোদক উপায় খুঁজছেন, মোটা দাঁও মেরে ভেগে পড়ার। সুযোগ পাচ্ছে না।

এমন সময় সুযোগ এল। হঠাৎই বলতে হবে। একজন বিজনেসম্যানের টাকাভর্তি সুটকেস বদল করলেন জগদীশ। আর সেটা নিয়ে লম্বা দিলেন হিরণ্ময়। একটু পরে জগদীশও পালিয়ে গেলেন। তাদের দুজনের মধ্যে কথা হয়েছিল, ধরা পড়লেও মালের কথা কেউ বলবেন না।

জগদীশ সুটকেস নিজের কাছে রেখে হিরণ্ময়কে ফোন করলেন ওর হোটেলে। ওকে বললেন, 'হিরণ্ময়, একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তুমি আমার জন্য মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করো। আমি যাচ্ছি।'

বলে পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করলেন পুলিশকে। অবশ্যই বেনামে।

হিরণ্ময় চতুর্বেদী জেলে গেলেন চার বছরের জন্য, কিন্তু তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি যে পুলিশ খবর পেল কীভাবে। পরে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছেন। তখনই শপথ নিয়েছিলেন, 'এর শোধ নেব।'

জগদীশ মোদক এরপর এই পাহাড়ি জায়গায় চলে এসেছেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখেছেন। তারপর সুনীতাকে বিয়ে করেছেন। সুনীতা উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাগানবাড়ি, গাড়ি—সব পেয়েছিল। বিয়ের মাসদশেক পরেই চিঠি পেলেন জগদীশ। লেখক তারই অতীতের সঙ্গী হিরণ্ময় চতুর্বেদী। সে সাড়ে তিন বছরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই চিঠি লিখেছে।

তিনি চিঠি পড়তে শুরু করলেন...।

জগদীশ,

প্রিয় বন্ধু আমার,

আমার দুঃখ তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করা হল না। হবে, খুব শিগগিরই হবে। আমি লোহার বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়েছি। শুনে তোমার প্রচণ্ড দুঃখ হবে জেনেও বলছি। ঠিকানা জানাবার প্রয়োজন নেই। ও আমি ঠিক খুঁজে নেব।

ইতি

হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

জগদীশ মোদক চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে একটুও দেরি করেননি। এর এক বছর পর লতার সঙ্গে তার আলাপ হয় রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে। সেই আলাপ ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, সুনীতা মোদকের কান ও চোখ বাঁচিয়ে। জগদীশ কাউকে ভয় পান না, এক হিরণ্ময়কে ছাড়া, কারণ সে সম্পূর্ণ অজানা বিপদ।

৬

মুহ্যমানের মতো বসে রইলেন জগদীশ মোদক। লতা তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল। নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে হল জগদীশ মোদকের। রুমালটা বার করে মুখে বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লতা বোসের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তারপর সিঁড়ি ধরে নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন। বারান্দায় দাঁড়ানো লতার দিকে হাত নেড়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

লতা বোস ফিরে এল ঘরে। এই বাড়িটা তার একার। তার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। মা-বাবা বহুদিন হল গত হয়েছেন। এই বাড়িটা তার বৃদ্ধ মামা মারা যাবার আগে উইল করে দিয়ে যান। লতা বোস এখন কোনো চাকরি করে না। আগের কিছু জমানো টাকা আছে, আর তাছাড়া জগদীশ মোদকও এটা সেটা কিনে দেন।

জগদীশ মোদককে লতা মোটেই অপছন্দ করে না। বরঞ্চ আরও পছন্দ করবে ভবিষ্যতে, যেহেতু তিনি লতা বোসকে এবার টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন; কারণ সামান্যই—লতা বোসই বর্তমানে জানে যে তিনি মানে জগদীশ মোদক একটা খুন করেছিলেন।

জগদীশ মোদক লতাকে বলেছিলেন যে, সুনীতা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিনি লতাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লতা বোস। কে জানে কবে সে সুযোগ হবে।

বাড়িতে ফিরে একটু অবাক হলেন জগদীশ মোদক। সুনীতা বেরুবার জন্য প্রস্তুত। জগদীশ আনন্দের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। বললেন, 'সুনীতা, কী ব্যাপার? কোনো পার্টি? না, অন্য কিছু?'

'পার্টি ছাড়া আমার কি অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই জগদীশ?'

'না, না, সুনীতা—তুমি ভুল বুঝছ। আমি সে কথা ভেবে বলিনি।' চাটুকারীর স্বর জগদীশ মোদকের কণ্ঠস্বরে।

'অনেক দিন হল বাড়িতে যাওয়া হয়নি, বাবার সঙ্গে দেখা করিনি।' একটু থামলেন সুনীতা, 'দেখা করতে ইচ্ছে করে না বুঝি?'

চমকে উঠলেন জগদীশ মোদক। এ কি কাকতালীয় না আর কিছু? মেঘ না চাইতেই জল। হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবে! যাবে বইকি। তবে আমি যে এখন ফিরে আসব তা তুমি জানতে?'

'না, এখন তোমাকে আমি মোটেও আশা করিনি, আশা করাও উচিত নয়, জগদীশ। সেই জন্যই তো তোমাকে উদ্দেশ্য করে ওই চিঠিটা।' বলে সশব্দে হাসলেন সুনীতা। টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

জগদীশ মোদক হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। পড়লেন, 'জগদীশ, আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তুমি খেয়ে নিও। রাত্রেই ফিরব—সুনীতা।'

'ওঃ, এই ব্যাপার।' হাসলেন জগদীশ মোদক। তারপর ওটাকে আবার টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'সুনীতা, তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। তবে বেশি রাত করো না। জানোই তো রাস্তা-ঘাট ভালো নয়।' অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন মোদক।

'তবে আমি যাই।' বেরিয়ে গেলেন সুনীতা।

গাড়ি নিয়ে গেটের কাছে পৌঁছতেই শিবরাম সেটা ওপরে তুলে ধরল। গাড়ি নিয়ে সুনীতা বেরিয়ে গেলেন। এই দূরের ঘরের জানলা থেকে দেখছিলেন জগদীশ মোদক। স্ত্রীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে

রহস্যময় হাসি হাসলেন তিনি। তারপর ফোনের জন্য হাত বাড়ালেন। রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন...

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—ফোনের রিসিভার তুলল লতা বোস। বললে, 'হ্যালো, কে?'

'আমি, জগদীশ।'

'কী ব্যাপার, হঠাৎ ফোন?'

'সুনীতা এইমাত্র বেরিয়ে গেল; ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে, বাড়ি এখন খালি।'

'বাড়ি খালি তো আমি কী করব?' ন্যাকা সাজল লতা বোস।

'একা একা বসে ভালো লাগছে না, চলে এসো। গল্প করব।' একান্ত অনুরোধের সঙ্গে জানালেন জগদীশ মোদক।

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।' একটু হেসে রিসিভার নামিয়ে রাখল লতা বোস। প্রসাধনে মনোযোগ দিল। তার মনে তখন বিচিত্র চিন্তাধারা। জগদীশ যে এত সহজে ফাঁদে পা দেবে তা লতা আশা করেনি। এখন জগদীশ যদি লতাকে ছাড়তে চায় তবে তার পক্ষে ছাড়া খুব মুশকিল হবে। কারণ, লতা বোসের যা জানা উচিত তার চাইতে অনেক বেশি জেনে ফেলেছে।

রমেশ আডবানির ব্যাপারটা লতা সহজে ভুলবে না!

৭

জগদীশ মোদক অতীতকে আলাদা আলাদা ভাবে ভাববার চেষ্টা করছিলেন। বিছানার উপর আধশোয়া অবস্থায় তিনি বসেছিলেন। বেলা প্রায় পৌনে একটা। সিগারের ধোঁয়া এখান সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সুনীতার কথাগুলো ঘুরে ফিরে তার মনে পড়ছিল। সুনীতা যে লতার কথা জেনে গেছে তা তিনি বুঝেছেন কাল রাত্রে শোবার সময়।

তার চোখে তখনও ঘুম আসেনি। ঘরের সিলিং-এর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। ঘর অন্ধকার। ঘরে সুনীতা এসে প্রবেশ করল। 'কী, এখনও ঘুমোওনি?'

'ঘুম আর আসছে কই।'

সুনীতা তার পাশে বসে তার কপাল টিপে দিতে লাগল। জগদীশ মোদকের তখন মনে পড়ছিল বিয়ের সময়ের কথা।

সুনীতা বললেন, 'জগদীশ, তুমি কি আমার চোখকেও ফাঁকি দিতে চাও?'

জগদীশ চমকে উঠলেন, বললেন, 'কেন?'

'শহরের সবাই তোমার কীর্তি জেনে ফেলেছে—তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, জগদীশ। শেষে একটা বিধবাকে বিয়ে করতে চাইছ?'

জগদীশ মোদক পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, 'সুনীতা আমি কী নিয়ে থাকব?'

সুনীতা কেঁদে ফেললেন। বললেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, 'জগদীশ, আমি জানি, আমি তোমাকে কিছু দিতে পারিনি—আমি—আমি সন্তানের জননী হতে পারিনি। তোমার মনকে পরিপূর্ণ করতে পারিনি। তবু—তবু আমার কি ইচ্ছে করে না—' গলা আটকে গেল সুনীতার। জগদীশও দুর্বল হয়ে পড়েছিল ওর সামনে। বললেন, 'কী? কী ইচ্ছা করে, সুনীতা? বলো—আমাকে বলো।'

সুনীতা মোদক চোখের জল মুছে তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি যাই।'

'না।' হাত ধরে টেনে ওকে আবার বিছানায় বসিয়ে দিলেন জগদীশ। তারপর সারা রাত ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

দ্বন্দ্বের দেওয়াল ডিঙিয়ে যেতে চেয়েছেন জগদীশ মোদক, পারেননি। ঘড়ির ঘণ্টায় তার চমক ভাঙল—একটা বাজে। সোজা হয়ে বসলেন। লতাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে এখন তার বিবেকে বাধছে।

হঠাৎ তার চোখ গেল জানলা দিয়ে দূরের দরজার সামনে। লতা—হ্যাঁ লতাই এসে দাঁড়িয়েছে সদর দরজার বাইরে। শিবরামকে মনে হয় গেট খুলতে বলছে। শিবরাম তখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে লতার

দিকে। বোধহয় আগে কোনোদিন দেখেনি বলে।

সুনীতাকে আবার না জানিয়ে দেয় ও, তবে একটু অসুবিধায় পড়বে জগদীশ। তিনি উঠে গিয়ে ফ্রিজের দরজা খুললেন। খাবার বার কে দুটো প্লেটে সাজিয়ে পাশের টেবিলে রাখলেন।

এমন সময় ঘরে ঢুকল লতা বোস। জগদীশ মোদক হাসি মু এগিয়ে গেলেন, বললেন, 'এসো—এসো।' লতা এসে বসল একা সোফায়।

একটু পরে বলল, 'সুনীতা কখন ফিরবে, জগদীশ?'

'রাত্রি বেলা।' জবাব দিলেন জগদীশ মোদক। তারপর বললে 'লতা, আগে স্নান করে নাও। তারপর খেয়েদেয়ে গল্প করা যাবে এই বলে তোয়ালে, সাবান এগিয়ে দিলেন জগদীশ মোদক।

লতা সেগুলো নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ উঠল লতা বোস। সত্যি—জগদীশের রুচি আছে বলতে হবে। বাথটাবটা দিকে চোখ গেল তার—অপূর্ব। ডানদিকের দেওয়ালে প্রায় ঘেঁ বাথটাবটা। বাথটাব আর দেওয়ালের মাঝের অল্প জায়গায় একটা ভারী লোহার জাল খাড়াভাবে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কেন?

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ওপর দিকে চোখ গেল লতা বোসের— 'ওঃ—তাই—' অনেকখানি আয়তাকার ফাঁকা জায়গা—জানলার মতো ওইখানেই লাগানো হবে বোধহয় জালটা। ওপাশে মনে হয় শোবা ঘর।

স্নান করার জন্য প্রস্তুত হল লতা বোস।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে দুটো সোফায় বসে খবরের কাগজ দেখছিলেন। হঠাৎ লতা বোস বলল, 'আচ্ছা জগদীশ, সুনীতার বাব সুনীতাকে কিছু দেয়নি?'

'কিস্যু না।' মিথ্যে বলতে আটকাল না তার মুখে।

'তুমি যদি হঠাৎ মারা যাও—তবে—তবে সুনীতার কী হবে?'

'লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকাটা পাবে।' নিস্পৃহভাবে জবাব দিলে জগদীশ মোদক।

'কত টাকা?' লতা বোস উৎসুক হল।

'সে অনেক—পঞ্চাশ হাজার।'

লতা বোস নড়েচড়ে বসল। দুজনেই খবরের কাগজ নামিয়ে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে লতা বোস বলল, 'জগদীশ, আমাকে কি চিরকাল অপেক্ষা করতে হবে?'

'কেন বল তো?'

'সুনীতার উপস্থিতিতে তুমি আমাকে বাড়িতে ডেকে আনতে ভয় পাও। অবশ্য সুনীতা না থাকলে সে কথাই ওঠে না—' অর্থপূর্ণ হাসি হাসল লতা বোস।

জগদীশ মোদক তার কথার অর্থ বুঝতে পারলেন, বললেন, 'তা, সত্যি।' জগদীশ তাঁর চিন্তাধারাকে বিচিত্র পথে মোড় ঘোরালেন—তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'লতা, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দুজনে উঠলেন। তারপর হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

গ্যারেজে পৌঁছে গাড়ি স্টার্ট দিলেন জগদীশ মোদক। তারপর লতা বোস উঠে বসল তার পাশে। গেটের কাছে গাড়ি পৌঁছলে শিবরাম লোহার ভারী দরজাটা তুলে ধরলো। গাড়ি বেরিয়ে গেল।

জগদীশ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন শিবরামের দিকে। ওর চোখে কি ঘৃণা, না আর কিছু? সুনীতাকে কি জানিয়ে দেবে ও? আজকালের মধ্যে না জানালেই হল। হাসলেন মনে মনে জগদীশ মোদক।

দড়াম করে গেটটা ফেলে দিল শিবরাম। শব্দটা কেঁপে কেঁপে দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

৮

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। আকাশ আজ বেশ পরিষ্কার। একটু আগেই বাইরে থেকে ফিরেছেন জগদীশ। চিন্তায় তার মাথা অত্যন্ত ভারী হয়ে গেছে।

বার বার ছোট বেলার কথা মনে পড়ছিল তার। মাস্টারমশায়রা ত্রিভুজ আঁকা শেখাতেন। নানারকম—সমকোণী, সমবাহু, বিষমবাহু।

বিষমবাহু ত্রিভুজটা আঁকা সব থেকে সোজা বলে মনে করতেন জগদীশ মোদক। তবে সেই ত্রিভুজ আঁকার বিদ্যেটা যে এখন কাজে লাগবে তা তিনি বুঝতে পারেননি।

বার বার আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছিলেন তিনি। যেন একটা রহস্যঘন নাটকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি।

যেন একটা রহস্যঘন নাটকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন শ্রীমতী সুনীতা মোদক। আজই তিনি একটা বোঝাপড়া করবেন। তার আর জানতে কিছুই বাকি নেই। তবে এমন কিছু তাড়াহুড়ো তিনি করবেন না, আগে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাক। জগদীশকে তিনি আগে বুঝতে পারেননি। চিরকালই কেমন রহস্যে ঢাকা তার চরিত্র।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন সুনীতা মোদক। সন্ধে ছ'টা বেজে আট মিনিট। তাড়াতাড়ি তৈরি হবার জন্য পাশের ঘরে গেলেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন। অত্যাচারের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু এই যে আপনাকে অবহেলা তার জন্য দায়ী জগদীশ। তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। ঘরে প্রবেশ করেছেন জগদীশ মোদক।

'সুনীতা,' ডাকলেন মৃদুস্বরে জগদীশ, 'আজ তোমাকে একটা বিচিত্র অনুরোধ করব।'

'কী বলো তো?' জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন সুনীতা মোদক।

'তোমার মনে পড়ে, সেই একবার তুমি থিয়েটারে পুরুষের পার্ট করেছিলে?' ঘনিষ্ঠ হলেন জগদীশ, 'আজ তোমাকে পুরুষের বেশ নিতে হবে। যা ফাইন দেখায় না তোমাকে! আজ একজনকে একটা সারপ্রাইজ দেব। না, না, প্লিজ, না কোরো না।'

সুনীতা মোদক আশ্চর্য হলেও কোনো অসম্মতি জানালেন না—রাজি হলেন। জগদীশ মোদক নিজে হাতে সুনীতাকে শাড়ির উপর দিয়ে

নিজের ওভারকোটটা পরিয়ে দিলেন। মাথায় পরালেন হ্যাট। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'ভেরি গুড...অপূর্ব! আচ্ছা শোনো সুনীতা, তুমি আগে বেরিয়ে পড়ো—আমি এদিকে একটা কাজ সেরেই তোমার সঙ্গে বড় রাস্তার উপর দেখা করব। তুমি রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। কেমন?'

'ঠিক আছে তাই হবে। তবে তুমি তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।'

'বিন্দুমাত্র চিন্তা কোরো না আমার জন্য।' আশ্বাস দিলেন জগদীশ। তারপর তিনি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। সেখান থেকেই শুনতে পেলেন সুনীতার বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ।

শিবরাম মাইজীর বিচিত্র সজ্জার কোনো সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পেল না। সে আরও অবাক হল, যখন দেখল যে তার বাবু বেরোলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

চারিদিক তখন গভীর অন্ধকারের কবলে সম্পূর্ণরূপে কবলিত।

৯

আজ সকালবেলার কাগজেই বেরোল সেই সংবাদটা।

গত পরশু রাত্রে জগদীশ মোদককে একা ফিরতে দেখে অবাক হয়েছিল শিবরাম। জগদীশের বেশবাস বিস্রস্ত, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলেন তিনি। শিবরামকে দেখে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। শিবরাম হতভম্ব হয়ে তাকিয়েছিল বাবুর দিকে।

আজ সকালের কাগজেই পড়লেন জগদীশ মোদক। দ্বিতীয় পাতার নীচের দিকে ছোট্ট করে বেরিয়েছে সংবাদটা।

এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে বড় রাস্তার বাঁকের মুখে। একটা বিধ্বস্ত পোড়া গাড়ি ও একজন ভদ্রমহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে খাদে। মহিলাটি একাই ড্রাইভ করছিলেন। তার কোনোও পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভবত অন্ধকার রাস্তায় বাঁকের মুখে গাড়ি ঘোরাতে পারেননি ভদ্রমহিলা, তাই এই বিপত্তি।

ঘটনাস্থলে কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র একটা ছেঁড়া সন্দেশের বাক্স পাওয়া গেছে। কারও কারও ধারণা, এই ঘটনাটি স্বাভাবিক নয়।

মৃতের লোকজনকে মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

জগদীশ মোদক একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবার আগে তার বোধহয় সুনীতার কথা মনে পড়ল। তিনি আর ভাবতে পারলেন না। চিন্তাশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে হাত বাড়ালেন রিসিভারের জন্যে। রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালেন। বলল, 'হ্যালো?'

ফোন বেজে উঠতেই তা তুলে নিল লতা বোস। এসময় এই ফোনটাই লতা আশা করেছিল। স্মিত হাস্যে তার মুখ ভরে উঠল। বলল, 'হ্যালো?'

উত্তর ভেসে এল—'কে লতা? আমি জগদীশ, আজকের কাগজ পড়েছ?'

'কেন? কী ব্যাপার?' অজ্ঞের ভান করলেন লতা বোস। তিনি এখন ভালোভাবেই জানেন জগদীশের বাড়ি যাওয়ায় আর কোনো ভয় নেই।

'ওঃ—সে কি আর ফোনে...ঠিক আছে, তুমি একবার আমার বাড়িতে চলে এসো।'

এবার রিসিভার-এর ভেতর থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। হাসল লতা বোস। কৌতুকের স্বরে বলল, 'জগদীশ, কাগজ আমি পড়েছি। রিয়্যালি এ বিউটিফুল শট। মার্ভেলাস। তোমার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে জগদীশ। তুমি বৃথা ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করছ। তুমি ভালো ভাবে জানো যে মৃত মহিলাটি শ্রীমতী সুনীতা মোদক ছাড়া আর কেউ নয়।...না, না—জগদীশ, তুমি বলবার চেষ্টা কোরো না যে, তুমি ওকে খুন করোনি। ও কীভাবে মারা গেছে তা আমি রকমসকম দেখেই বুঝতে পারছি। তাছাড়া এ কথাই কি তুমি বলতে চাও যে এর আগে একটাও খুন করোনি? করেছ জগদীশ। একথা তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করেছ যে, তোমার বিজনেসের জেনারেল ম্যানেজার রমেশ আডবানিকে তুমি খুন করেছ। পুলিশ এখনো সুরেশ দাসকে

খুঁজছে। সুতরাং—'

ফোনের ওপাশে রীতিমতো হাঁফাচ্ছিলেন জগদীশ মোদক। কোনোরকমে বললেন, 'লতা প্লিজ—চুপ করো, আমি সব দোষ স্বীকার করছি...পরে ওসব শুনব...এখন একবার কাইন্ডলি চলে এসো তুমি...প্লিজ।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।' লতা বোসের মুখ ক্রূর হয়ে উঠল। ওয়ার্ডরোব খুলে ভেতর থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করে ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিল। জগদীশকে বিশ্বাস করবে? লতা বোস নিশ্চয়ই বোকা নয়।

১০

রিসিভার নামিয়ে রেখে খুব হাসলেন জগদীশ মোদক। ব্ল্যাকমেলিং জীবনে যা কেউ কোনোদিন তাকে করতে পারেনি তা করবে লতা বোসের মতো দুধের মেয়ে! মুখের হাসির রেখা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল। দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন আলমারিটার কাছে। অর্থব্যঞ্জক ভাব দেখা গেল তার মুখে।...

অনীশ চৌধুরী সূত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিলেন। ছেঁড়া সন্দেশের বাক্সতে কোনোই হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। তবে এ ক'দিনের চেষ্টায় তিনি প্রায় সমস্ত পূর্ব ঘটনা জানতে পেরেছেন। মৃতার পরিচয় বার করতে তার আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই দেখা করছেন অনীশ চৌধুরী। এখন শুধু বাকি মৃতার স্বামী জগদীশ মোদক। আজ রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। এই দুর্ঘটনাটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যা বলেই তাঁর মনে হয়েছে। পূর্ব ঘটনা জানার পরই তার এই ধারণা হয়েছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন অনীশ চৌধুরী। একবার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে।

হঠাৎই আবিষ্কার করলেন জগদীশ মোদক। হঠাৎই বলতে হবে। দেখলেন, তার বাড়ির পেছন দিকে একজনের পায়ের ছাপ। তবে কি এ বাড়িতে কেউ প্রবেশ করেছে? কে হতে পারে?

জগদীশ মোদক যতই নিজের বিবেকের কাছে অস্বীকার করুন না কেন, তিনি বুঝতে পারছেন যে এত পথ ডিঙিয়ে তার বাড়ি খুঁজে, পাঁচিল টপকে ভেতরে অনধিকার প্রবেশ করার লোক মাত্র একজনই আছে, সে হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

সদরের লোহার দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লতা বোসকে। শিবরাম একটু অবাক হলেও দরজা খুলে দিল।

ওকে ভ্রূকুটি করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল লতা বোস। তার মন অশান্ত হয়ে উঠছে।

তবে একটা জিনিস জগদীশ মোদক বুঝতে পেরেছেন। তা হল জগদীশ মোদক নিজে 'মাউসট্রাপে' পড়েছেন!

রাত এখন প্রায় আটটা। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা। সুউচ্চ পাঁচিলের বাইরে গাড়ি দাঁড় করালেন অনীশ। সেটা বাড়ির পেছন দিক। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সদরের লোহার গেটের কাছে এসে, পকেট থেকে টর্চ বার করলেন। সেই আলোয় পথ দেখে চলতে চলতে অনুভব করলেন, তার পকেটের হিম-শীতল অটোমেটিকটা।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল একজনের পায়ের ছাপ—পাশে গোল গোল দাগ। সম্ভবতঃ ওয়াকিং স্টিকের দাগ।

এগিয়ে চললেন অনীশ চৌধুরী। হত্যা যদি হয়ে থাকে তবে তিনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন তার সমাধান করার জন্য।

সেই সময়েই গেটের কাছে বসেছিল শিবরাম। ও ভাবছিল, লতা বোস এখনও বাড়ি গেলেন না কেন? এত রাত অবধি কোনোদিন তো তাকে থাকতে দেখেনি শিবরাম।

এমন সময় স্লাইড গেটের বাইরে কাউকে দেখা গেল। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শুধু ছায়া ছায়া ভাবে অবস্থিতিটা বোঝা যাচ্ছিল। শিবরাম একটা টর্চ বার করে আগন্তুকের মুখের ওপর ফেলল। ঢেউ খেলানো চুল, ছোট ছোট চোখ, আর লম্বা তীক্ষ্ণ সরু গোঁফ।

আগন্তুক এবার কথা বললেন, 'এটাই জগদীশ মোদকের বাড়ি?'

শিবরাম ঘাড় কাত করে জানাল, 'হ্যাঁ।'

'দরজা খোল।' আগন্তুকের ব্যক্তিত্বময় কণ্ঠ শোনা গেল।

ইতস্ততঃ করে দরজা খুলে দিল শিবরাম। ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেলেন আগন্তুক, লম্বা কাঁচা রাস্তা ধরে দূরের ছোট্ট সাদা বাড়িটার দিকে দ্রুত পা চালাচ্ছিলেন।

আগন্তুক যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, শিবরাম গেট নামিয়ে তালা দিচ্ছে।

১১

নিশ্চিত মনে বসেছিলেন জগদীশ মোদক। চারিদিক সমান করে দিয়েছেন একদম। দু-একটা গাছ লাগাতেও ভোলেননি তিনি। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন দরজায় নক করার শব্দ শুনে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করল সেই আগন্তুক। পরনে চাপা প্যান্ট-শার্ট আর একটা হাল্কা রবার সোলের সু।

'আপনি?' জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশ মোদক।

'আমার নাম অনীশ চৌধুরী।' একটু থেমে আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, 'জানতে এলাম কীভাবে ম্যানেজ করলেন?'

'আপনাকে কি জল দেব?' সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন জগদীশ মোদক।

'তার কোনো প্রয়োজন নেই স্যার। বসতে পারি?'

'ওহো—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—'

'আপনাকে আগে আমার কাছে পুরো ঘটনাটা শুনতে হবে। আপত্তি আছে?'

'না। বলতে পারেন এবার।'

একটু নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করলেন অনীশ চৌধুরী, 'পুলিশ কি বিকেলে আপনার কাছে এসেছিল মিঃ মোদক?'

'হ্যাঁ।'

'সুনীতা মোদক যাওয়ার আগে আপনাকে বলে যাননি?'

'না। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছিল, এই দেখুন।' বলে একটা চিঠি জগদীশ মোদক এগিয়ে দিলেন। সেই চিঠি—যেটা তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন পরে কাজে লাগতে পারে বলে। ভাগ্যিস সুনীতা চিঠিটাতে কোনো তারিখ দেয়নি সেদিন।

'হুঁ।' সন্দিগ্ধভাবে জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী। তারপর বললেন, 'মিঃ মোদক, চিঠিটা একদিনের পুরানো। কারণ আমরা জেনেছি খুন হওয়ার আগের দিন মিসেস মোদক একবার তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন...চিঠিটা সেইদিনই লেখা।

'মিসেস মোদক সন্দেশ খেতে খুব ভালোবাসতেন ঠিকই তবে মাথায় ছিট না হলে কি কেউ গাড়ি চালাতে চালাতে সন্দেশ খায়? আপনিই বলুন! তবে? তবে কি কেউ তাকে সন্দেশ খেতে অনুরোধ করেছে গাড়ি থামিয়ে? আপনি সুনীতা দেবীকে মিথ্যা কথা বলে আপনার পোশাক পরিয়ে বাঁকটার ধারে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। যারা তাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে তারা ভেবেছে আপনি। রাস্তায় আলো নেহাতই কম ছিল।

'এর কিছুক্ষণ পরেই আপনি বেরোলেন নিঃশব্দে অন্য গাড়িটা নিয়ে। হ্যাঁ, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করবেন না। আপনার দুটো সিমিলার সাদা রঙের অ্যামবাসাডর গাড়ি আছে, মানে ছিল। কারণ একটা তো ধ্বংস হয়ে গেছে। যাহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি পৌঁছে গেলেন

স্পটে। নেমে সুনীতা দেবীকে বললেন, আপনার গাড়িতে উঠে আসতে।

'আপনি তখন আপনার কোটহ্যাট চেয়ে নিজে পরলেন, তারপর সুনীতা দেবীর দিকে এক বাক্স সন্দেশ তুলে দিলেন। অনেকদিন আগের কেনা। সুনীতা দেবী গাড়ির স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে টপাটপ শুরু করলেন সন্দেশ খেতে। আপনি আগেই নিউট্রল গিয়ার করে রেখেছিলেন। এইবার গাড়িটাকে ঠেলতে শুরু করলেন খাদের দিকে। খাদের ধারেই দাঁড় করিয়েছিলেন গাড়িটা, তাই বেশি ঠেলতে হল না। সুনীতা দেবী চিৎকার করতে চাইলেন—পারলেন না। কারণ, সন্দেশের কৃপায় গলা বুঁজে গেছে—তার গলা থেকে যা শব্দ বেরোল উঁ উঁ করে, তা তা কেউ শুনতে পেল না। সুতরাং মৃত্যু হল সুনীতা মোদকের।

আপনি আপনার গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলেন। ভাগ্যক্রমে সেখানে সন্দেশের ছেঁড়া বাক্সটা পড়েছিল, তাতে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। আপনি খুব সতর্কভাবে ফিরে এলেন বাড়িতে। পুলিশ সুনীতা দেবীর খোঁজ জানতে চাইলে তাদের বোকা বানিয়েছেন ওই বাতিল পুরোনো চিঠিটা দিয়ে। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন, মিঃ মোদক, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। আশাকরি, আমি ঠিকভাবে গুছিয়ে বলতে পেরেছি?'

কথা শেষ করে অনীশ চৌধুরী জগদীশ মোদকের মুখের দিকে তাকালেন।

জগদীশ মোদক হেসে বললেন, 'ওই সামান্য প্রমাণে কিছুই করতে পারবেন না, মিঃ চৌধুরী। আরও প্রমাণ খুঁজুন—'

'তার কোনো প্রয়োজন নেই, মিঃ মোদক, এই ক'টা প্রমাণই আপনার হাতে হাতকড়া পরানোর পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া আডবানিকে হত্যা করার চার্জ তো এখনো বাকিই আছে।'

এই কথা ক'টা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিপর্যয় ঘটে গেল। পলকের মধ্যেই জগদীশ মোদক তার অত ভারী শরীরটাকে শূন্যে তুলে লাফ দিলেন ঘরের একমাত্র আলো টেবিল-ল্যাম্পটার দিকে। ঘর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। নিমেষের মধ্যে সোফাটার পেছনে গিয়ে উপস্থিত হলেন অনীশ চৌধুরী। হিপ পকেট থেকে টেনে বার করলেন অটোমেটিকটা।

ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বাইরের থেকে আসা কিছু আলো এখানে ওখানে ঠিকরে পড়ছে। অনীশ চৌধুরী বললেন, 'মিঃ মোদক, বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। বেরিয়ে এসে ধরা দিন। বাড়ির বাইরেটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে।'

প্রত্যুত্তরে এক ঝলক আলো ও শব্দ ভেসে এল। অনীশ চৌধুরী চকিতে আড়ালে সরে গেলেন। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন কীভাবে দরজার কাছে পৌঁছনো যায়। তিনি নিঃশব্দে হাঁটুতে ভর দিয়ে এগোতে লাগলেন দরজার দিকে।

দরজার একটা পাল্লা যে ভেজানো ছিল তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাই তার শরীরের ধাক্কা লেগে দরজা আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু কোনো কিছু ঘটবার আগেই তিনি সিধে হয়ে দৌড় লাগালেন বাড়ির বাইরে।

বিশাল বাগানের মধ্য দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে তিনি শুনতে পেলেন, পেছনে জগদীশ মোদকের ধাবমান পায়ের শব্দ। তবু তিনি দৌড়লেন লোহার দরজার দিকে। জগদীশ মোদককে জীবিত অবস্থায় ধরতে চান তিনি।

এমন সময় বাড়ির বাইরে দৌড়ে এলেন জগদীশ মোদক। গতি থামিয়ে দিলেন হঠাৎ। উদভ্রান্তের মতো তাকালেন ডাইনে-বাঁয়ে। তারপর হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তেই পরপর দুবার গুলি করলেন— দুড়ুম—দু—ড়ুম।

অনীশ চৌধুরী তখন লোহার গেট তালা দেওয়া দেখে ওটা বেয়ে উঠছিলেন পাঁচিল ডিঙোনোর জন্য। রবার সোলের জুতো থাকায় উঠতে সুবিধে হচ্ছিল বেশ, আর একটু হলেই পাঁচিল টপকাতে পারতেন—হল না। ধপ করে নীচের কাঁচা জমিতে লাফিয়ে পড়লেন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন পাশের ঝোপের দিকে।

'মিঃ চৌধুরী, আমার হাত থেকে আপনি পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।—বাগানের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল।' হাঁফাচ্ছিলেন জগদীশ মোদক। তার উত্তেজনা চরমে। চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে। তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। নিজের শুকনো ঠোঁটদুটোর উপর একবার জিভটা বুলিয়ে

নিলেন। তার চোখ তখনও অনীশ চৌধুরীকে খুঁজছে; তার অবস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করলেন জগদীশ মোদক।

কাঁচা রাস্তার একধারে রাখা লোহার বিমগুলোর উপর দৃষ্টি পড়ল অনীশ চৌধুরীর। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুড়লেন লোহার বিমগুলো লক্ষ্য করে। আওয়াজ হল—ঠং—। বেশ জোরেই।—

সঙ্গে সঙ্গেই সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়লেন জগদীশ মোদক। দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজে চারিদিকের পাঁচিল যেন হা-হা করে হেসে উঠল।

অনীশ চৌধুরী মনে মনে সময় গুনছিলেন। এইবার একটা ফায়ার করেই পাশের বড় গাছটার পেছনে আশ্রয় নিলেন। জগদীশ মোদক কালবিলম্ব না করেই ঝোপ লক্ষ্য করে অবশিষ্ট গুলিটি ফায়ার করলেন। সেটা তার কাল হল।

১২

মুহূর্তমাত্রও দেরি না করে লাফ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী। প্রায় পঁচিশ হাত দূরেই জগদীশ মোদকের বিশাল বপু কাঁচা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে। যেন ঝুলন্ত দড়ির উপর দাঁড়িয়ে দুজন।

একটুও দেরি না করে পিস্তলের ঘোড়ায় চাপ দিলেন জগদীশ মোদক।

হো-হো করে হেসে উঠলেন অনীশ চৌধুরী। বললেন, 'আর চেষ্টা করে লাভ নেই, মোদক। ওটার গুলি ফুরিয়েছে। এখন সব ছলাকলা ত্যাগ করে ধরা দিন। ইউ আর আন্ডার আরেস্ট, মিঃ জগদীশ মোদক।'

জগদীশ মোদক কিছুটা সময় হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তার পরেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের খালি পিস্তলটা প্রচণ্ডবেগে ছুটে এল অনীশ চৌধুরীর দেহ লক্ষ্য করে।

অনীশ চৌধুরী ক্ষিপ্রগতিতে ডান দিকে লাফ দিলেন। গিয়ে পড়লেন

বুনো ঝোপের মধ্যে। সেখান থেকে দৃষ্টি ফেলতেই অবাক হলেন; জগদীশ মোদক অপসৃত হয়েছেন তার দৃষ্টিপথ থেকে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন, কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরোলেন না।

এদিকে একটা বড় শাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিলেন জগদীশ মোদক। পালাবার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু নিজের ওই ভারী দেহ নিয়ে কীভাবে পাঁচিল ডিঙোবেন তিনি? এপাশ ওপাশ করছিলেন অসহিষ্ণু হয়ে।

এমন সময় তার পিছনে আবির্ভূত হল একটি ছায়ামূর্তি, তার হাতে একটা সিল্কের ফাঁস।...

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অনীশ চৌধুরী আবার সাদা বাড়িটার দিকে এগোলেন। অত্যন্ত সাবধানে। কোনোরকমে যদি একবার পুলিশে খবর দিতে পারেন। কাঁচা রাস্তার ধার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি অবশেষে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আলো না জ্বালিয়ে কোনোরকমে ড্রইংরুমে পৌঁছলেন। টেলিফোনটা অনুভব করলেন হাতে।

রিসিভার তুলেই থানায় ডায়াল করলেন। 'হ্যালো?'

'ইয়েস,...থানা।'

'ইন্সপেক্টর রাঘবন আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কুইক, ফোর্স নিয়ে আসতে বলুন, ঠিকানা...'

'অলরাইট।' কট করে রিসিভার রাখার শব্দ হল।

জগদীশ মোদক পিছনে জুতোর খসখস শব্দ শুনেই পিছন ফিরে তাকাতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎগতিতে গলায় বসে গেল সিল্কের ফাঁস। শোনা গেল বিদ্রূপাত্মক চাপা হাসি।

প্রাণান্ত চেষ্টা করেও ফাঁসের বাঁধন এতটুকুও আলগা করতে পারলেন না তিনি। ফাঁস গলায় প্রায় কেটে বসেছে।

পেছন থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'জগদীশ, মাই ডিয়ার, নিজের ভবিতব্যকে নিশ্চয়ই সামনে দেখতে পাচ্ছ। তুমি অনেক অপরাধ করেছ...

আমার...আমার মেয়েকে খুন করেছ...! হ্যাঁ, লতা—লতা বোসই আমার মেয়ে—বিধবা মেয়ে। আমি জানতাম না তুমি এত নীচ। ওকে তোর এখানে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। লতার জন্মের মাস কয় পর থেকেই আমি বাড়ি ছাড়া...ও জানে আমার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ওকে যে চিনতে আমার ভুল হয়নি তা তুইও বুঝতে পারবি!—স্কাউনড্রেল।'

জগদীশ মোদকের চিন্তাধারা আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে, তবু তিনি দেখলেন, তার ভুল হল না। আগন্তুক নিজের টর্চ নিজের মুখে ফেললেন। তার আলোতেই জগদীশ মোদক পরিষ্কার ভাবে দেখলেন আগন্তুকের কপালে, ডান কপালে একটা কালো জড়ুল... যা লতা বোসেরও ছিল!

জগদীশ মোদকের সামনে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় চতুর্বেদী। সে তখনও বলে চলছে, 'শয়তান! আমিই তোর চিরকালের বন্ধু, হিরণ্ময় চতুর্বেদী—' শেষটুকু শুনবার আগেই জগদীশ মোদক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

সিল্কের ফাঁসটা মাটিতে ফেলে দিয়ে গেট লক্ষ্য করে হাঁটা দিল হিরণ্ময় চতুর্বেদী।

১৩

ফোন করা হয়ে যেতেই ফিরে আসছিলেন অনীশ চৌধুরী। হাতের টর্চের আলোয় সামনের কাঁচা রাস্তাটা আংশিক আলোকিত হচ্ছিল।

আনমনা ভাবে চলতে চলতে পাশের গাছ-গাছড়ার দিকে টর্চের আলো পড়তেই দেখলেন একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তিনি এগিয়ে গেলেন—চিৎ করে দিলেন দেহটাকে।

এ কী! তার সামনে পড়ে আছে জগদীশ মোদকের মৃতদেহ—চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে—দেহ নিষ্প্রাণ। গলার চারিদিকে কালসিটে।

মৃত্যুর কারণ খুঁজতে এপাশ ও পাশ চাইলেন অনীশ চৌধুরী। অদূরেই

পড়ে আছে একটা সিল্কের ফাঁস। হাতে তুলে নিলেন সেটাকে। সরু হলে কী হবে, বেশ শক্ত।

অনীশ চৌধুরী ভেবেই পেলেন না, জগদীশ মোদককে কে হত্যা করতে পারে। কারণ তিনি ঢোকার পর লোহার সদর গেট বন্ধ করেছে শিবরাম। তবে তো শিবরামের সাহায্য ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না এখানে। কারণ বাইরে থেকে পাঁচিল বেয়ে ওঠা সহজসাধ্য নয়।

আগেই খোঁজ খবর নিয়েছেন অনীশ চৌধুরী। মোদক দম্পতি আর তাদের চাকর শিবরাম ছাড়া আর কেউ থাকে না এখানে। তবে বাড়ির পেছন দিকে পায়ের ছাপটা কার? শিবরামের? সে তো খোঁড়া। তবে কি শিবরামের পা খোঁড়া নয়? ওটা ধোঁকা!

তিনি শুনেছিলেন, শিবরাম নতুন কাজে লেগেছিল...

আর চিন্তা না করে গেট লক্ষ্য করে দৌড়োলেন অনীশ চৌধুরী। দরজার কাছে পৌঁছে পাঁচিল ডিঙোবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে দেখলেন—গেট খোলা!—তালাটা নেই। মুহূর্তের মধ্যে গেট খুলে নিজের শরীরটাকে বাইরে বার করে নিয়ে দরজাটা ফেলে দিয়েই ছুটলেন। দূরে দেখতে পেলেন টর্চের আলো—নিশ্চয়ই পুলিশের।

দৌড়তে দৌড়তে পৌঁছলেন পুলিশ জিপের কাছে। দেখেন ইন্সপেক্টর রাঘবন, সঙ্গে আর্মড ফোর্স—একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন তিনি।

কোট প্যান্ট পরা। পায়ে দামি শু, হাতে একটা লাঠি। আর ডান কপালে একটা কালো জড়ুল।

অনীশ চৌধুরী হঠাৎ এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোকের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

'হিরণ্ময় চতুর্বেদী।'

'এখানে এসেছিলেন কী জন্য?'

'জগদীশ মোদকের সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'একমিনিট, ইন্সপেক্টর,' বলেই অনীশ চৌধুরী হঠাৎ ভদ্রলোকের পকেটে হাত গলিয়ে দিলেন। বার করে আনলেন একটা চাবি। সেটা ভালো করে দেখে বললেন, 'মিঃ চতুর্বেদী, জগদীশ মোদকের সদর দরজার চাবি আপনার পকেটে এল কী করে? হ্যাঁ, আমি জানি এর

সদুত্তর আপনার কাছে নেই।'

ইতস্তত করতে লাগল চতুর্বেদী।

এইবার আর এক বিচিত্র কাণ্ড করলেন অনীশ চৌধুরী। হিরণ্ময় চতুর্বেদীর পায়ের জুতো এক টান মেরে খুলে ফেললেন—সকলেই দেখলেন তার পা ধুলোময়।

'আপনি আমার চোখে ফাঁকি দিতে পারেননি, মিঃ শিবরাম চতুর্বেদী।'

যেন বজ্রপাত হল!

'আপনি প্রতিহিংসার জন্য জগদীশ মোদকের বাড়িতে শিবরাম নাম নিয়ে চাকরের কাজ নেন। আমি আপনাদের পূর্ব ঘটনা সমস্তই জানি। আপনার বসন্ত রোগ হয় জেলে—তাতে আপনার একটা চোখ কানা হয়ে যায়। আপনার সুবিধাই হয় তাতে, কারণ ছদ্মবেশ নিতে হবে না বিশেষ। তবু একটু মেকআপ নিলেন আর খোঁড়ার অভিনয় করলেন। অবসর সময়ে আপনি লাঠি নিয়ে পায়চারি করে বেড়াতেন। তারই ছাপ দেখেছি বাড়ির বাইরে আর ভিতরে। আমি ঢোকার পর আপনি ছদ্মবেশ ছেড়ে, নিজের আনা ভদ্র পোশাকটা পরে নেন।। তারপর জগদীশ মোদককে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।' থামলেন অনীশ চৌধুরী।

এইবার ডুকরে কেঁদে উঠল হিরণ্ময় চতুর্বেদী। বলল, 'জগদীশ আমার মেয়েকে খুন করেছে। আমার মেয়ের ছোটবেলায় বাড়ি আমি থেকে চলে যাই। সে সময় ওর কপালে একটা জড়ুল ছিল—ঠিক এই আমার মতো। তাই এতদিন পরে ওকে জগদীশের কাছে লতা বোসকে দেখেই চিনতে পারি আমার মেয়ে বলে। ও সেই যে সকালে বাড়িতে ঢুকেছে এখনো বেরোয়নি।' ভেঙে পড়লেন মিঃ চতুর্বেদী।

মিঃ রাঘবন নির্দেশ দিলেন তাকে থানায় নিয়ে যেতে। পুলিশ ভ্যান হিরণ্ময় চতুর্বেদীকে নিয়ে রওনা দিল।

চারজন কনস্টেবল, অনীশ চৌধুরী ও মিঃ রাঘবন পুনরায় এসে ঢুকলেন জগদীশ মোদকের বাড়িতে। তারপর চলল সন্ধান পর্ব। কোথাও পাওয়া গেল না লতাকে।

বাথরুমে একটা হাত আষ্টেক লম্বা তার পেলেন অনীশ চৌধুরী। একটু স্যাঁতসেঁতে। ঘরের আলমারি খুলে দেখেন খালি বোতল পর

পর সাজানো। গন্ধ শুঁকলেন—কিছু বুঝতে পারলেন না। জগদীশ মোদকের ডায়েরিটা পেলেন।

বাগানটা খুঁড়ে দেখবার নির্দেশ দিয়ে অনীশ চৌধুরী আর ইন্সপেক্টর রাঘবন বেরিয়ে এলেন। তারপর জিপে চড়ে, থানার দিকে চললেন।

১৪

একটু অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে চন্দন দেবনাথ, 'অনীশদা, লতা বোসের মৃতদেহ তবে পাওয়া গেল না?'

অনীশ চৌধুরী পাইপে নতুন তামাক ভরে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পাওয়া গেল দুদিন পর। বাগানেই মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছিল। তবে সেটাকে মৃতদেহ না বলে তার ভগ্নাবশেষ বলাই ভালো— পোস্ট মর্টেম থেকে জানা গেছিল লতা বোস অ্যাসিডে পুড়ে মারা গেছেন। সালফিউরিক অ্যাসিড।'

'কী বীভৎস!' মন্তব্য করলেন মোতি চৌধুরী।

'এইবার দুটো প্রশ্ন আছে। যার উত্তর আমি এখনও পর্যন্ত পাইনি। এক নম্বর, সুনীতা দেবীকে হত্যার মোটিভ। আর দু'নম্বর, লতা বোসকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল?' প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী।

মোতি চৌধুরী একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লতা বোসকে বিয়ে করার জন্যই তার নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছেন জগদীশ মোদক।'

'না ঠিক তা নয়।' মৃদুকণ্ঠে শুরু করল চন্দন দেবনাথ, 'কারণটা একটু অন্যরকম। ওই লাইফ ইন্সিওরেন্সটা জয়েন্ট ছিল, মানে সুনীতা মোদক যেমন জগদীশ মারা গেলে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকাটা পেতেন, তেমনি জগদীশ মোদকও পেতেন সুনীতা দেবী মারা গেলে। আর লতা বোস তো চাপ দিচ্ছিলই।'

সুনু লাহিড়ী এইবার বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, লতা বোসকে হত্যার মোটিভের কথা আপনি বাদ দিয়েছেন। সেটা বোধহয় আমি বোঝাতে

পারব। রমেশ আডবানির হত্যার খবরটা শোনার পর থেকে লতা বোস জগদীশ মোদককে ব্ল্যাকমেল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ তার নিজের শেষ জীবনের জন্য কিছু মোটা সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য সুনীতা দেবীকে হত্যা করতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি, যাতে জগদীশ মোদক তাকে বিবাহ করেন।

'জগদীশ মোদক দেখলেন লতা বোসের কথাও শুনতে হবে আর টাকাও আসবে। তাই সুনীতা দেবীকে খুন করতে দ্বিধা করলেন না। এবং পরে লতা বোসের দাবি শুনে বুঝলেন তিনি ফাঁদে পড়েছেন। তখনই বাধ্য হয়ে লতা বোসকে বাড়ি থেকে এনে অ্যাসিড দিয়ে হত্যা করলেন—যা তিনি বহুদিন ধরে অল্প অল্প করে কিনেছিলেন সুনীতা দেবীকে হত্যা করার জন্য। পরে লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকাটার জন্য হত্যার অন্য উপায় বের করেন।'

সুনু লাহিড়ী থামতেই অলক মুখার্জী বললেন, 'তবে বোধহয় অ্যাসিড কেনার ক্যাশমেমোগুলোই লাইটার জ্বেলে তিনি সেদিন বনের মধ্যে পুড়িয়ে ছিলেন?'

'রাইট।' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন অনীশ চৌধুরী। বললেন, 'স্বাভাবিক।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল চন্দন দেবনাথ, 'ওঃ—কী নৃশংস—অনীশদা! লতা বোসকে অতি জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কীভাবে তিনি লতা বোসকে খুন করেছেন তা ভাবতেও গা শিউরে উঠবে।

'লতা বোস আসার আগেই বাথরুমের বাথটাব থেকে সমস্ত জল বার করে দিলেন জগদীশ মোদক। আলমারির মধ্যে থেকে অ্যাসিডের বোতলগুলো এনে তা থেকে সমস্ত অ্যাসিড ঢেলে দিলেন বাথটাবের মধ্যে। ওটা ভর্তি হল অ্যাসিডে। তারপর সেই ভারী লোহার জালটার মাথায় সরু তারটা বাঁধলেন। তারপর সেটাকে বাথটাবের ঠিক ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে জানলাটা দিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন।

'লতা বোস জগদীশ মোদকের অনুরোধে বাথরুমে চান করতে গেলেন। জগদীশ মোদক শোবার ঘরে গিয়ে তারটা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। লতা বোস জামাকাপড় খুলে বাথটাবে নামলেন। সঙ্গে

সঙ্গে তার ধরে টান দিলেন জগদীশ মোদক। ধপাস করে জালটা—ভারী লোহার জালটা পড়ল বাথটবের ওপর। ভারী লোহার জাল ঠেলে বেরোতে পারল না লতা বোস। কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডে পুড়ে মারা গেল।'

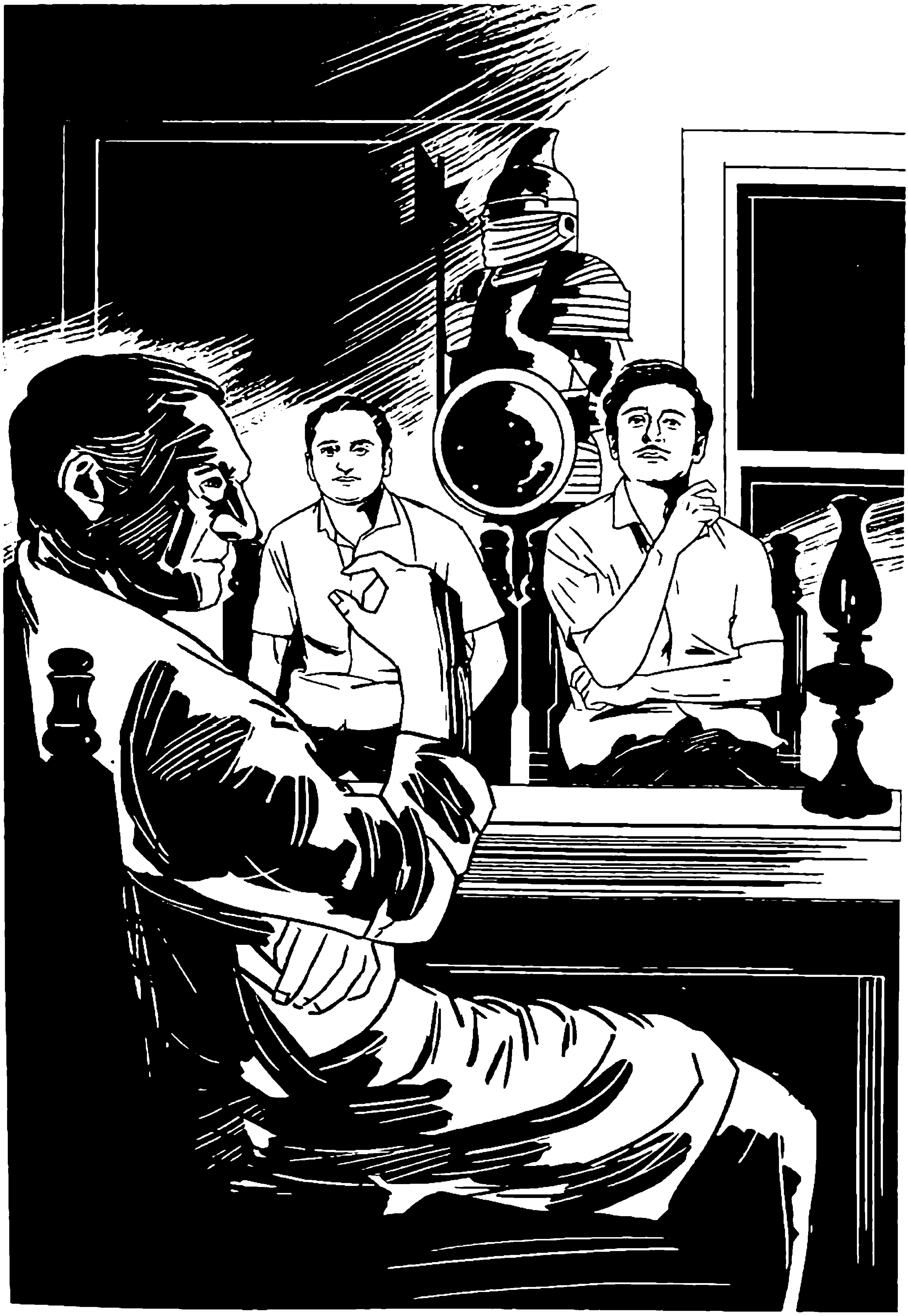
'ওঃ, বীভৎস। জগদীশ মোদক...একটা পাক্কা শয়তান ছিল—' মোতি চৌধুরী দু'হাতে চোখ ঢাকলেন।

'তারপরের ব্যাপারটুকু অতি সহজেই অনুমেয়।' বললেন অনীশ চৌধুরী, 'অ্যাসিড বার করে দিয়ে বাথটাব আবার জলে ভরে রাখলেন জগদীশ মোদক। জালটাকে তুলে আগের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারটা খুলে ধুয়ে রাখলেন। অ্যাসিডের বোতলগুলো ধুয়ে রাখলেন। তারপর লতা বোসের মৃতদেহ বাগানে গর্ত করে পুঁতে ফেললেন। তার ওপর কয়েকটা গাছের চারা লাগিয়ে দিলেন।

'কিন্তু গণ্ডগোল করলেন হিরণ্ময় চতুর্বেদী। তিনি জগদীশ মোদককে তার এতগুলো পাপের শাস্তি দিলেন। জগদীশ মোদক ওকে চিনতে পারেননি।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ সকলে। ঘড়ির দিকে তাকালেন সবাই। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে।

উপন্যাস



অচল গড়ের রহস্য

Arajakata Exclusive

অনীশ চৌধুরী।

বাংলা দেশের নামি-অনামি ডিটেকটিভদের মধ্যে একটি নাম— যিনি একদা নিজেই একটি ব্যক্তিগত রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপরই তাঁর রহস্য-জগতে পদক্ষেপ। দোহারা, বলিষ্ঠ চেহারা। সরু টানা গোঁফ, চোয়ালের রেখা কঠিন, গায়ের রং তামাটে, একমাথা চুল। সময়ে অসময়ে গগলস ব্যবহার করেন। অন্যান্য ডিটেকটিভদের মতো তিনি ব্যাচেলর নন। তাঁর স্ত্রী রত্নটির নাম মোতি চৌধুরী। অনীশ চৌধুরীর একটি শেভ্রলে গাড়ি আছে, কিন্তু তিনি সাধারণত সেটা ব্যবহার করেন না। এই হল অনীশ চৌধুরীর পরিচয়।

গত বছর শীতকালে তিনি একটা রহস্যময় চিঠি পান। তারপর নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি যে রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েন, সেই নিয়েই এ কাহিনি রচিত হয়েছে। একটি শীতের সন্ধ্যা। আমাদের গল্পের পর্দা উঠল।...

বিকেলের ডাকে যে চিঠিগুলো এসেছিল, সেইগুলোই পড়ছিলেন অনীশ চৌধুরী। হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ল এক চিলতে কাগজ। তিনি সেটা তুলে নিলেন। একটা চিঠি। দেখে বোঝা যাচ্ছে, এ চিঠি ডাকে আসেনি, কেউ তাঁর বাড়ির ডাকবাক্সে হাতে করে ফেলে দিয়ে গেছে। চিঠিটা পড়লেন অনীশ চৌধুরী।

এত সংক্ষেপে যে কেউ বক্তব্য শেষ করতে পারে, তা তাঁর জানা ছিল না। চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

অচলগড় প্যালেস, মাইথন
বিহার

মিঃ চৌধুরী,

আমার সম্পত্তি অনেক। উইল করার আগেই বোধ হয় মারা যাব। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

ইতি—
শ্রীরবিশঙ্কর বর্মা

চিঠিটা পড়ে খুবই অবাক হলেন অনীশ চৌধুরী। এক্ষেত্রে উকিলের প্রয়োজন, না এক্সরে আই-এর প্রয়োজন, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। অভ্যাসবশে চিঠিটাকে প্যান্টের বাঁ-পকেটে রাখলেন, তারপর ফোন করলেন চন্দন দেবনাথের বাড়িতে।

চন্দন দেবনাথ অনীশ চৌধুরীর বন্ধু। ভদ্রলোক পেশাদার জুয়াড়ি। যে-কোনো রকম জুয়ায় সিদ্ধহস্ত। তিনি নিজেকে লাই ডিটেক্টর মনে করেন এবং অবসর সময়ে অঙ্ক কষেন। তার মতে—যখনই কোনো রহস্য তোমার কাছে জটিল বলে মনে হবে, তখনই অঙ্ক কষবে। তাহলে দেখবে রহস্য আর রহস্য নেই, অঙ্কের মতোন ছকে পড়ে গেছে। এছাড়া অঙ্ক কষলে তোমার গ্রে সেলগুলোও ভালো কাজ করবে।

ফোনে দেবনাথকে পেলেন না অনীশ চৌধুরী। সম্ভবত তাসের আড্ডায়। উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন, ছ'টা পঁচিশ। বাইরে আকাশ একেবারে কালো মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। শীতকালে এই রকম মেঘলা আকাশ কল্পনাতীত।

এমন সময় হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল মোতি চৌধুরী। তাকে দেখে অনীশ চৌধুরী বললেন, 'মোতি, এখন আর চা খাব না, একটু বেরোব। আমার ওয়াটারপ্রুফটা দাও, বাইরে বোধ হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে ওয়াটারপ্রুফটা এনে দিল মোতি। সেটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অনীশ চৌধুরী। মোতি দরজা বন্ধ করার আগে শুধু বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরো—'

নির্বিকারভাবে ঘাড় হেলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তার গন্তব্যস্থান বর্তমানে 'সিসিল বার'। কারণ সময় ও ধারণা অনুযায়ী চন্দন দেবনাথের সেখানেই থাকার কথা।

রাস্তায় পা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চলতে লাগলেন অনীশ চৌধুরী। ঝোড়ো হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট এসে তাঁর চোখে-মুখে লাগছিল। রাস্তা-ঘাট এর মধ্যেই ফাঁকা হতে শুরু করেছে।

সিসিল বার-এ ঢোকবার আগের মোড়ে পৌঁছতেই পিঠে ওয়াটার-প্রুফের ওপর কঠিন কিছু একটা অনুভব করতেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তার পেছনে কারো ভোক্যাল কর্ড কেঁপে উঠল ঃ 'হ্যান্ডস আপ, প্লিজ।'

বলা মাত্র আদেশ পালন করলেন অনীশ চৌধুরী।

'এই বৃষ্টিতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যিই অস্বস্তিকর, মিস্টার চৌধুরী', পেছন থেকে হাস্যতরল কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ 'চিঠিটা বার করে দিন, কুইক—'

'কোন চিঠিটা?' বোকা সাজলেন অনীশ চৌধুরী। জানতে চাইলেন আগন্তুক চিঠিটা সম্বন্ধে আর কতটা জানে।

'একটু আগে সন্ধেবেলায় যে চিঠিটা পেয়েছেন—যার লেখক রবিশঙ্কর বর্মা। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন কোন চিঠিটা?'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকের বাঁ-হাত চলে গেল অনীশ চৌধুরীর বাঁ-পকেটে। চিঠিটা হাতে ঠেকতেই সেটা সে বার করে নিল। তারপর বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, এবার সিধে চলে যান, কর্মস্থলে আবার দেখা হবে,—' রিভলভারের নলটা দিয়ে সে একটা ধাক্কা দিল। পরক্ষণেই কী মনে হতে অনীশ চৌধুরীর ডান পকেটটাও হাতড়াল—সম্ভবত রিভলভারের খোঁজে। রিভলভার না থাকাতে নিশ্চিন্ত হল সে, তারপর মোড় ঘুরেই উল্টো দিকে দ্রুতপদে হাঁটা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী। লোকটাকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি তখনো একইভাবে মুষলধারে ঝরে চলেছে।

কে এই লোকটা? চিন্তা করলেন অনীশ চৌধুরী। মিঃ বর্মা চিঠিতে

কি প্রচ্ছন্নভাবে এর ভয়ই প্রকাশ করেছিলেন? নাকি এর সঙ্গে আরও কেউ সংযুক্ত আছে—যারা রবিশঙ্কর বর্মার বিরুদ্ধে একটা জটিল চক্রান্তের জাল গড়ে তুলেছে?

কিন্তু লোকটা এই চিঠির কথা জানল কেমন করে? তবে কি এ মিঃ বর্মার পরিচিত কেউ, যে চিঠি লেখার সময় তার কাছে উপস্থিত ছিল?

হেসে ফেললেন অনীশ চৌধুরী। এই রহস্যময় জাল থেকে বেরোবার ইচ্ছা তাঁর আপাতত নেই। এতগুলো প্রশ্নের উত্তর তাকে জানতেই হবে।

তার কাছে প্রথম সূত্র হবে লোকটির উচ্চতা, কারণ লোকটি একটা ছোট্ট ভুল করে গেছে। তা হল রিভলভারটা তাঁর পিঠে ঠেকিয়ে।

কোনো লোক যদি একটা রিভলভার তার পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় ঠেকায়—অবশ্যই স্বাভাবিক ভাবে, তবে তার উচ্চতা কত হতে পারে, সেটাই ভাবতে ভাবতে তিনি সিসিল বারের দিকে রওনা দিলেন।

তার বারবার মনে হচ্ছিল, লোকটি রবিশঙ্কর বর্মার পরিচিত।

একটু পরেই সিসিল বারে প্রবেশ করলেন তিনি। বৃষ্টি তখন কিছুটা পরে এসেছে।

উজ্জ্বল মায়াময় পরিবেশ। মৃদু টুং-টাং শব্দ। কারোর দিকে কারো খেয়াল নেই, সবাই যে যার নিজের পরিধিতে মশগুল।

দৃঢ় পদক্ষেপে ভেতর দিকে পা বাড়ালেন অনীশ চৌধুরী। গগলসটা পকেট থেকে বার করে চোখে দিলেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন আন্ডার গ্রাউন্ড ঘরটার দিকে যে ঘরে জুয়া খেলা হয়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমেই জুয়ার বোর্ড। তার চারদিকে ঘিরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সব লোক। এধারে-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকে তাস খেলায় মত্ত। অনীশ চৌধুরীর চোখজোড়া ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে স্থির হল একজনের ওপর।

তার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি—এই শীতকালেও। চোখে কালো চশমা। গলায় নেকটাই-এর মতো করে নট দিয়ে মাফলার বাঁধা। তার চোখের দৃষ্টি হাতের দিকে নিবদ্ধ। সে-হাতে তিনটি তাস ধরা রয়েছে।

মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হল তার মুখ। চটপট তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'চন্দন, তুমি এখানে আছ? তবে, আসবার পথে প্রাণটা প্রায় গিয়েছিল আর কি!'

অনীশ চৌধুরীর গলা শুনেই চমকে উঠে দাঁড়ালেন চন্দন দেবনাথ। হাতের তাস তিনটে টেবিলে ফেলে দিয়ে অনীশের কাছে গিয়ে বললেন,—'অনীশদা, আপনি! কালো চশমাটা খুলুন, আপনাকে চেনা যাচ্ছে না মোটেই। আরে, গায়ে বর্ষাতি কেন?'

'বাইরে মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছিল,' জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'তুমি আর জানবে কেমন করে? বাইরে চলো, কথা আছে। বোধ হয় বৃষ্টি এখন ধরে এসেছে।'

ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। বৃষ্টি অনেকটা কমে এসেছে। দুজনে তার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়িতে পৌঁছে অনীশ চৌধুরী জামা-কাপড় পাল্টে দেবনাথের পাশে এসে বসলেন। ইতিমধ্যে মোতি এসে দু-কাপ চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেবনাথ প্রশ্ন করলেন, 'অনীশদা, ব্যাপার কি গুরুতর?'

'তা কিছুটা বলতে পারো। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখো, কালকে আমরা মাইথন রওনা দিচ্ছি। আমরা শ্রীরবিশঙ্কর বর্মার অতিথি হব। কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ পত্রটা—মানে চিঠিটা খোয়া গেছে...' আদ্যোপান্ত খুলে বললেন অনীশ চৌধুরী : 'চিঠিটা যদি এভাবে চুরি না যেত, তবে আমি বোধ হয় ব্যাপারটাকে এতটা গুরুত্ব দিতাম না।'

'লোকটাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারেননি আপনি?' সব শোনার পর দেবনাথ প্রশ্ন করলেন।

'না, আমার দুর্ভাগ্য সেটা।'

'কাল ক'টায় ট্রেন?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিগ্যেস করলেন চন্দন।

'সম্ভবত সাড়ে তিনটেয়। তুমি আড়াইটের মধ্যে রেডি হয়ে আমার এখানে চলে এসো।'

ঘাড় হেলিয়ে বিদায় নিলেন দেবনাথ। ঘড়িতে তখন আটটা।

স্টেশনে নেমে রিক্সাওয়ালাকে অচলগড় প্যালেসের কথা বলতেই সে সম্মতি জানাল। অনীশ চৌধুরী ও চন্দন দেবনাথ উঠে বসলেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যে সাইকেল-রিক্সা তাঁদের অচলগড়ের অদূরেই পাকা রাস্তায় নামিয়ে দিল। ভাড়া মিটিয়ে দুজনে কাঁচা মেঠো পথ ধরলেন।

অস্তায়মান সূর্যের আলোচ্ছটায় আলোকিত লাল রাঙা মেঘের পটভূমিকায় বিশাল প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দাঁড়িয়েছিল অচলগড় প্যালেস। তার বিশালতায় সূর্যদেব ঢাকা পড়েছেন।

'এখানে এমন প্রাসাদের কথা আগে কিন্তু শুনিনি, অনীশদা।' একটু আশ্চর্য হন চন্দন দেবনাথ।

'সত্যিই অপূর্ব!' অবাক হয়ে অনীশ চৌধুরী বললেন, 'রবিশঙ্কর বর্মা বেশ পয়সাওয়ালা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে।'

এমন সময় প্রাসাদশীর্ষে একজনকে দেখা গেল। মূর্তিটা অনড়—যেন কালো কষ্টিপাথরে তৈরি। উজ্জ্বল আলোর পটভূমিকায় সেটাকে ছায়ামূর্তি বলেই মনে হচ্ছিল। চন্দন দেবনাথ চোখ তুলে তাকালেন; অনীশ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অনীশদা, দেখুন—'

সঙ্গে-সঙ্গেই তাকালেন অনীশ চৌধুরী, কিন্তু কিছু একটা বলবার আগেই মূর্তিটি অদৃশ্য হল প্রাসাদশীর্ষ থেকে; কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনীশ চৌধুরী বললেন, 'লোকটি কি আমাদের দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রাসাদশীর্ষে উঠেছিল? নাকি আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার উদ্দেশে এই আকস্মিক আবির্ভাব?'

দেবনাথ কোনো জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁরা প্রাসাদের ভারী দরজার কাছে এসে পৌঁছেছেন। কালো গ্র্যানিট পাথর দিয়ে প্রাসাদ-প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। দরজার সামনে একটা ছোট ঘণ্টা দেখো, সেটা বাজালেন অনীশ চৌধুরী—ঠং-ঠং-।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল! খোলা দরজায় যাকে দণ্ডায়মান দেখা গেল তাকে এ-যুগের ঘটোৎকচ বললেও আপত্তি করার কিছু থাকে না। লোকটা অপেক্ষাকৃত সরু গলায় বলল, 'আপনারাই কি কলকাতা থেকে আসছেন?'

সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় হেলালেন অনীশ চৌধুরী। কিন্তু এর পরের প্রশ্নে থতমতো খেয়ে গেলেন দুজনেই।

'চিঠিটা এনেছেন কি?'

লোকটার দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেন বজ্রপাতের মতো প্রতীয়মান হল দুজনের কাছে। সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'চিঠিটা হারিয়ে গেছে—মানে চুরি হয়ে গেছে ওটা—কলকাতাতেই।'

ততক্ষণে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। পকেট থেকে চটপট একটা সুদৃশ রিভলভার বার করে ফেলেছে লোকটা—আর সেটা উঁচিয়ে ধরেছে দুজনকে লক্ষ্য করে। দুজনেই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালেন। লোকটা এগিয়ে এসে পকেট হাতড়ে দেবনাথের রিভলভারটা বের করে নিল; অনীশ চৌধুরীর রিভলভার তাঁর পকেটে ছিল না—সুটকেশে ছিল। সুতরাং দুজনে লোকটার কথামতো ভেতরে প্রবেশ করলেন।

প্রাসাদের বেশিরভাগ অংশই পাথরে গঠিত। আশ্চর্যের বিষয়, কোথাও ইলেকট্রিকের আলো দেখা গেল না। বাড়িতে লোকজনও বেশি নেই, যেন নিঝুমপুরী। অতি পুরাতন জীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাসাদের সবক'টা গুণই বর্তমান। বাইরের আলো ভেতরে পৌঁছয় অনেক কষ্ট করে। দুই একটা হ্যারিকেন জ্বালানো আছে বড় বড় থামগুলোর পাশে। লোকটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার নির্দেশ দিল। অনীশ চৌধুরী লোকটার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টায় বললেন, 'মিস্টার বর্মা কি দোতলায় থাকেন?'

'না।'

'বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

লোকটা কোনো জবাব দিল না। কিন্তু তার রিভলভারধৃত হাত খোঁচা দিল তাঁর পিঠে।

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেন অনীশ চৌধুরী। বললেন, 'মিস্টার বর্মা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন কেন জানো?'

'বেশি বকবক না করে ওপরে চলুন।' লোকটার বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঠিক তখনই সিঁড়ির ওপর থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কীচক, রিভলভারটা পকেটে রেখে দাও।'

ভিজে বেড়ালের মতো আদেশ পালন করল লোকটি। তারপর সুড়সুড় করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

এবার বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসলেন অনীশ চৌধুরী।

যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার পরনে একটা বড় স্লিপিং গাউন। নিখুঁতভাবে কামানো মুখ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। রগের কাছে চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। দেখে মনে হয়, তিনি কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী—তীক্ষ্ণ নাক।

'আপনারা ওপরে আসুন।' দু-হাত বাড়িয়ে সাদর আহ্বান জানালেন তিনি, 'আমি—আমিই শ্রীরবিশঙ্কর বর্মা। আপনারা।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'আমি অনীশ চৌধুরী, আর ইনি আমার সঙ্গী—চন্দন দেবনাথ। আমি কলকাতায় গতকাল আপনার চিঠি পেয়েছিলাম। হয়তো আমি এতদূর উইদাউট অ্যাডভান্সে আসতাম না, যদি না সেই চিঠিটা রহস্যময়ভাবে অপহৃত হতো। আশাকরি, আপনি আর আমাদের অন্ধকারে রাখবেন না—'

রবিশঙ্কর বর্মা অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে লম্বা টানা বারান্দা ধরে এগোলেন। এই বারান্দা 'ইউ'-র মতন ঘোরানো। এখান থেকে নীচের চৌকো উঠোনটা স্পষ্ট দেখা যায়।

রবি বর্মা তাদের একটা বড় হলঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ঘরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড টেবিল, সম্ভবত ডাইনিং টেবিল। এই ঘরটা হয়তো বা ডাইনিং রুম রূপেও ব্যবহৃত হয়। টেবিলটার ওপর প্রায় মধ্যস্থলে একটা বড় কেরোসিন ল্যাম্প। ঘরের দেওয়ালে প্রাচীন সব অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো—ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, ছোরা ইত্যাদি। ঘরের বাঁ-দিকের কোনায় পূর্ণ সজ্জিত অবস্থায় একটি বর্ম দাঁড় করানো, যেন একটি মানুষ।

রবিশঙ্কর বর্মা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি কিন্তু আপনাকে কোনো চিঠিই পাঠাইনি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী।

চন্দন দেবনাথ বিরক্ত হলেন; বললেন, 'চিঠিটা যদি থাকত, তবে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা যেত। চিঠিই যখন নেই, তখন আপনার

কথা বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য। যা হোক, আপনি ঘটোৎকচকে একবার ডাকুন—

'ঘটোৎকচ!'

—ওই লোকটি, যাকে আপনি কীচক বলে সম্বোধন করলেন একটু আগে।'

'ও!' আশ্বস্ত হলেন রবি বর্মা। তারপর নিজেই উঠে বেরিয়ে গেলেন কীচককে ডাকতে। কিছুক্ষণ বাদে ওকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। মৃদু আলোছায়ায় কীচকের মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল।

অনীশ চৌধুরী ওকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যে চিঠিটার কথা বলছিলে, সেটা কোন চিঠি?'

'চিঠি—?' কীচক যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি তো কোনো চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিনি আপনাকে!'

চন্দন দেবনাথ অনীশ চৌধুরীর দিকে তাকালেন—দুজনে চোখাচোখি হল—তারপর দেবনাথ বললেন, 'ঠিক আছে; তুমি এখন যাও, হয়তো আমাদের ভুল হয়েছে।'

অনীশ চৌধুরী ভাবছিলেন, রবি বর্মার চিঠি—আততায়ীর চিঠি চুরি—প্রাসাদশীর্ষে ছায়ামূর্তি—কীচকের চিঠির বিষয়ে প্রশ্ন করার কথা অস্বীকার আর সর্বোপরি রবিশঙ্কর বর্মা কোনো চিঠিই পাঠাননি—এ রহস্যের শেষ কোথায়? কীচক কী করে জানল যে, তারাই কলকাতা থেকে আসছেন? তিনি এটুকু বুঝতে পারলেন যে, রহস্যের জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, সে জাল কেটে তাকে বেরোতেই হবে। যাই ঘটুক না কেন, এর শেষ কোথায় তা তিনি দেখবেনই।

রাতে খাবার সময় অনীশ চৌধুরী ও চন্দন দেবনাথ উপস্থিত হলেন সেই প্রকাণ্ড হলঘরেই, সেখানেই ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে আরও তিনজন অপরিচিতকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রবি বর্মা।

প্রথমজন একটু রোগাটে চেহারার। লম্বা নাক, টুথব্রাশ গোঁফ, মোটা

ভুরু, চোখে চশমা। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। মোটের ওপর দেখলেই হাসি পায়। তার পরনে ঢোলা ফুলপ্যান্ট ও সাদা হাফশার্ট।

'ইনি হলেন দীনেশ সিং; আমার চণ্ডীগড়ে যে জমিদারী আছে, তার ম্যানেজার।—আর দীনেশ, এরা হলেন অনীশ চৌধুরী ও চন্দন দেবনাথ—রহস্য সন্ধানী।'

দ্বিতীয়জন একজন যুবতী। বয়স আন্দাজ বিশ-বাইশ বছর। দেখতে সুশ্রী, ভুরুর পাশে একটা কাটা দাগ, যেন সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

'মিস্টার চৌধুরী, এই হল আমার মেয়ে—অচলা বর্মা। এই বছর বি-এ পাশ করেছে।'

তৃতীয়জন মোটামুটি বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ। চোয়ালের রেখা শক্ত, সরু গোঁফ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বয়স তিরিশের পিঠোপিঠি। চোখে-মুখে একটা উদ্ধত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। দৃষ্টিও সন্দিগ্ধ।

'আর এ হল সোমেশ দত্ত। ফিজিক্সে এম. এস. সি; প্রফেসরী করে—যদিও এটা ওর মনঃপূত নয়। এছাড়া ওর বড় পরিচয় হল, ও আর অচলা এনগেজড।'

দেবনাথ ও অনীশ চৌধুরীর নমস্কারের প্রত্যুত্তরে প্রত্যেকেই হাত তুলে নমস্কার জানালেন। দীনেশ সিং-এর ঊর্ধ্বাঙ্গের কিছুটা চাদরে ঢাকা। মুখ-চোখ দেখে বুদ্ধিমান বলেও মনে হয়।

সকলেই টেবিলে প্রস্তুত হয়ে বসলেন। টেবিলে এখন একটি পিতল নির্মিত বাতিদান রাখা হয়েছে। তাতে বড় বড় কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। কীচক এগিয়ে এসে একাই পরিবেশন করতে লাগল।

খেতে খেতে হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন রবি বর্মা, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি আর এদের কাছে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না—তাই এদের মনের কৌতূহল দূর করার জন্য সব খুলে বলাই ভালো।—আচ্ছা, আপনি আমার নামে যে চিঠিটা পেয়েছিলেন, সেটাতে ঠিক কী লেখা ছিল বলতে পারেন?'

অনীশ চৌধুরী প্রত্যেকের মুখের ওপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে—বললেন, 'মিস্টার বর্মা, চিঠিটা এত ছোট ছিল যে আমার প্রায়

মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ভাষাটা ছিল, 'মিস্টার চৌধুরী, আমার সম্পত্তি অনেক। উইল করার আগেই বোধ হয় মারা যাব। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।'

'কথাগুলো আমি না লিখলেও, কিন্তু সর্ব্বৈ মিথ্যা নয়।' বললেন রবিশঙ্কর বর্মা, 'জানি না কে চিঠিটা পাঠিয়েছে, কিন্তু সে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। মিস্টার চৌধুরী, আপনি জানেন না, গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার জীবনের ওপর তিনবার আক্রমণ হয়েছে। তিনবারই কিন্তু আশ্চর্য ভাগ্যবলে আমি রক্ষা পেয়েছি।

'প্রথম যেবার আক্রমণ হয়, তখন আমি অসুস্থ, জ্বরে শয্যাশায়ী। গরমের জন্য তখন জেনারেটারের সাহায্যে পাখা লাগানো হয়। আমি হঠাৎ পাশ ফিরে শোবার পরমুহূর্তেই পাখাটা সিলিং থেকে আমার বিছানায় এসে পড়ে—আমি অল্পের জন্য বেঁচে যাই। তারপর আমার চিৎকারে সবাই ছুটে আসে। সোমেশই দেখেশুনে বলে যে, পাখার রডটা অনেকখানি কাটা ছিল।

'দ্বিতীয় আক্রমণটা হয় এর একমাস পরেই। মিস্টার চৌধুরী, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, নানারকম প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রে এ ঘরটা সাজানো। এর মধ্যেই আছে লম্বা ধরনের দু-একটা তরোয়াল। শুনেছি, আমাদের প্রপিতামহরা নাকি এগুলো দিয়েই যুদ্ধ করেছিলেন। বহুদিন যত্ন সহকারে রাখার জন্যে এগুলোর ধার এখনো পুরোপুরি বর্তমান। যা হোক, রাতে বাথরুমে যাবার সময় আমি হ্যারিকেন বা মোমবাতি ব্যবহার করি না। একদিন রাত্রে বাথরুমে যাবার জন্য বাথরুমের দরজায় পা দিতেই আমার স্লিপিং গাউনটা দরজার প্রান্তে আটকে যায়। আমি দরজাটা নাড়িয়ে ছাড়াতে যেতেই আমার পায়ের কাছে কোনো ধাতব শব্দ হয় ঠং করে। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে ফিরে এসে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখি, একটা লম্বা তরোয়াল মেঝেয়, বাথরুমের দরজার ভেতর দিকে পড়ে আছে। মনে হয় কেউ আমার গলা সমান উঁচুতে আড়াআড়িভাবে সেটা আটকে রেখেছিল। কিন্তু কে যে করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি।

'এই ঘটনা ঘটার দিন কুড়ি পরেই হয় তৃতীয় আক্রমণ। এটা কিন্তু

আগের দুবারের চেয়ে আরও বেশি ভয়াবহ বলে মনে হয়েছিল আমার। আমি সেদিন প্রাসাদশীর্ষে উঠেছিলাম। আর কোনো কারণে নয়, এটা আমার অভ্যাস। মাঝে মাঝে আমি প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখি। সেদিনও অন্যান্য দিনের মতো আনমনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমাকে প্রবল ধাক্কা দিল—আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। তারপর কোনো রকমে ধারের লোহার রেলিং ধরে সামলে নিয়েই পেছন ফিরে তাকালাম। কে যেন দৌড়ে পালাল, আমি তাকে চিনতে পারলাম না।

'মিস্টার চৌধুরী, এখন আমি এই জন্য খুব ভয়ে ভয়ে থাকি।' মাথা নিচু করলেন রবিশঙ্কর বর্মা : 'আমি আপনাকে আমার জীবন রক্ষার ভার দিলাম।' সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

সকলেরই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল—প্রত্যেকেই হলঘর ত্যাগ করলেন।

অনীশ চৌধুরী ও চন্দন দেবনাথ নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরে এলেন। রাত প্রায় দশটা বাজে। চন্দন বললেন, 'অনীশদা, ব্যাপার খুব ঘোরালো মনে হচ্ছে।'

'অনেকটা তাই।' চিন্তিত মনে জবাব দিলেন অনীশ চৌধুরী। 'ব্যাটা ঘটোৎকচ রিভলভারটা কেড়ে নিল, কাল ফেরত নিতে হবে।' রুষ্ট স্বরে দেবনাথ বললেন।

'থাকগে, ওসব বাদ দিয়ে এখন শুয়ে পড়ো।'

হারিকেন নিভিয়ে দিয়ে দুজনে শুয়ে পড়লেন।

চন্দন দেবনাথ তখনও ভাবছেন, চিঠিটা পাঠালই বা কে? আর চুরি করলই বা কে? কেন?—ভাবতে ভাবতে একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল দেবনাথের। বাইরের টানা পাথুরে বারান্দায় কার যেন অতি সতর্ক লঘু পদশব্দ? তড়িৎগতিতে লাফ দিয়ে দরজার কাছে উঠে এলেন তিনি। ভারী দরজার কাঠের পাল্লা ফাঁক করে বাইরের বারান্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। একী! কে এই ছায়ামূর্তি?

ছায়ামূর্তি ততক্ষণে হলঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। তার বাঁ-

হাত থেকে কিছু একটা ঝুলছে। চন্দন দেবনাথ এবার বেরিয়ে এলেন বারান্দায়—অনুসরণ করলেন অগ্রবর্তী ছায়ামূর্তিকে। হলঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেটা ঠেলে ঢুকে গেল ছায়ামূর্তি। একটু পরেই সে-পথে প্রবেশ করলেন দেবনাথ।

একী? ঘর যে অন্ধকার। অভ্যাসবশত পকেট থেকে টর্চ বার করতে গিয়েই মনে পড়ল যে টর্চ আনতে তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘরের কোণে একটি দীপশিখা জ্বলার ফলে তার দেখতে কিছু অসুবিধা হল না। একটু অবাক হলেন দেবনাথ—তার অগ্রগামিণী একজন নারী, এবং তিনি নিঃসন্দেহে অচলা বর্মা। এত রাত্রে সতর্কভাবে সকলের চোখ এড়িয়ে তিনি কোথায় চলেছেন? হলঘরের দেওয়ালের গায়ে সাজানো অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, পোশাকগুলোকে ওই মৃদু আলোয় যেন জীবন্ত মনে হচ্ছিল।

এই অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠেই দেবনাথ দেখলেন ঘরে তিনি সম্পূর্ণ একা। আলোটা কিন্তু ঘরের কোণেই রাখা আছে। তিনি কিন্তু নিশ্চিত যে তাঁর পাশ দিয়ে কেউই ঘর থেকে বেরোয়নি। তবে কোথায় অদৃশ্য হলেন অচলা বর্মা? একী রহস্য? কী কারণে অচলা বর্মার এই গোপন অভিসার?

চন্দন দেবনাথ দাঁড়িয়ে রইলেন। হলঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তার মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি এই অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করবেনই। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় সময় গড়িয়ে চলল।

দেবনাথ যদি হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাতেন তবে দেখতে পেতেন, হলঘরের দরজা খুলে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলেন।

হলঘরের দরজা ততক্ষণে পুনরায় বন্ধ হয়ে গেছে।

ভোরের দিকের ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল অনীশ চৌধুরীর। উঠে বসে খেয়াল বশেই ঘড়ির দিকে তাকালেন—পৌনে সাতটা বাজে। পরক্ষণেই তাঁর খেয়াল হল, ঘরে তিনি একা—দেবনাথ ঘরে নেই।

সচমকে উঠে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী। কী ব্যাপার? চন্দনের তো আটটার আগে ঘুম ভাঙে না। কোথায় গেল তবে?

তিনি চিন্তিত মুখে একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন। বেরোতেই দেখলেন রবি বর্মা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়—রেলিঙে ভর দিয়ে। তাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী, 'মিস্টার বর্মা, দেবনাথকে দেখেছেন?'

'না তো!' বললেন রবিশঙ্কর বর্মা, 'কোথাও গেছেন বোধ হয়; এখুনি চলে আসবেন।'

ঠিক এই সময় ছুটতে ছুটতে এলেন দীনেশ সিং, এসেই মিঃ বর্মাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'স্যার, হলঘরে মিস্টার দেবনাথ পড়ে আছেন, আপনারা শীগগিরই একবার চলুন—'

'সেকী!!' প্রচণ্ড অবাক হলেন রবিশঙ্কর বর্মা, পরক্ষণেই স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি শিগগির আসুন আমার সঙ্গে।'

দীনেশ সিং আগেই চলে গিয়েছিলেন। রবি বর্মা ও অনীশ চৌধুরী দ্রুতপদে হলঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

অনীশ চৌধুরীই প্রথমে ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, কিছুটা এগিয়ে বাঁ-দিকের দেওয়ালের গায়ে পড়ে আছেন চন্দন। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে তুলে নিলেন, তারপর নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। পেছনে পেছনে এলেন রবিশঙ্কর বর্মা, দীনেশ সিং আর কীচক।

ঘরে পৌঁছে কীচককে জল আনতে নির্দেশ দিলেন রবি বর্মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই কীচক এক বালতি জল নিয়ে এসে হাজির হল। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখ মেলে তাকলেন চন্দন। সাগ্রহে সবাই ঝুঁকে পড়লেন ওর মুখের ওপর!

দেবনাথ কথা বলবার চেষ্টা করতেই, অনীশ চৌধুরী ইশারায় তাকে জানালেন চুপ করে থাকতে। রবিশঙ্কর বর্মা এবার কথা বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন বলে মনে করছি আমি—'

'না, না, তার কোনো প্রয়োজন নেই, মিস্টার বর্মা!

'মিস্টার দেবনাথের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই না স্যার?' আমতা আমতা করে বললেন দীনেশ সিং।

কটমট করে তার দিকে তাকালেন রবি বর্মা। দীনেশ সিং তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

এমন সময় অনীশ চৌধুরী বললেন, 'মিস্টার বর্মা, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। লাঞ্চের সময় আমরা দুজনেই উপস্থিত থাকব—নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।'

'তাই যেন হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর ত্যাগ করলেন রবি বর্মা।

অনীশ চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, দেবনাথ একটা চিরুনি দিয়ে চুল আচড়াচ্ছেন। তার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই একটু হেসে চন্দন অপরাধীর মতো বললেন, 'অনীশদা, একটা ব্যাপার জানতে গিয়ে এই অবস্থা—ভাগ্য ভালো, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।

আদ্যোপান্ত খুলে বললেন চন্দন ঃ 'অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলো ঘরে এসে পড়ছিল, সেটা অন্ধকারে ঢেকে গেল হঠাৎ। তারপর সতর্ক হবার আগেই একটা ভারী কিছুর আঘাতে ঘুরে পড়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই। ইস, এখনো ফুলে আছে জায়গাটা!

'হুঁ, চিন্তিত স্বরে বললেন অনীশ চৌধুরী, 'মিস্টার বর্মাকে বলে তোমার রিভলভারটা কীচকের কাছ থেকে ফেরত নিও; রিভলভার ছাড়া আর বাইরে বেরোবে না। এখন চলো, মুখ-হাত ধুয়ে নেওয়া যাক।' এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন দীনেশ সিং ঃ 'মিস্টার বর্মা ব্রেকফাস্ট টেবিলে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' কথাগুলো বলেই তিনি দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেছিলেন সোমেশ দত্ত, অচলা বর্মা ও রবিশঙ্কর বর্মা। অনীশ এবং চন্দন নিজেদের আসন গ্রহণ করলেন।

রবি বর্মা তার উদগ্র কৌতূহলকে আর চেপে রাখতে পারলেন না; প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার দেবনাথ, ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো?'

সবাইয়ের মুখের ওপর একবার করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দেবনাথ জবাব দিলেন, 'মিস্টার বর্মা, আমি এর জন্য লজ্জিত। বলতেও আমার

লজ্জা করছে—মানে আমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলার অভ্যেস আছে।'

অচলা বর্মা ও সোমেশ দত্ত হেসে ফেললেন। শুধুমাত্র রবিশঙ্কর বর্মা অতিরিক্ত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'ও।'

'মিস্টার বর্মা,' এবার কথা বললেন অনীশ চৌধুরী, 'আপনার কীচককে বলবেন চন্দনের রিভলভারটা ফেরত দিতে, এটা ছাড়া ওর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে।'

রবিশঙ্কর বর্মা কিছু বলবার আগেই কীচক রিভলভারটা কোত্থেকে এনে টেবিলের ওপর ঠকাস করে রেখে দিল। দেবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ওটা নিয়ে পকেটে চালান করলেন।

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোতে যেতেই হঠাৎ দেবনাথের নজর গেল হলঘরের কোণের দিকে—সেখানে রয়েছে একটা ছোট প্রদীপ। কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, লক্ষ করলেন, তেল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় প্রদীপটি নিভে গেছে।

টেবিল ছেড়ে সকলেই উঠে এলেন, এক অচলা বর্মা ছাড়া। প্রত্যেকের চোখেই এক প্রশ্ন আঁকা রয়েছে, কী এটা? দেবনাথ দেখালেন সবাইকে। তারপর ধীরপদে রবিশঙ্কর বর্মার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'মিস্টার বর্মা, একথা আজ স্পষ্ট করে বলে ফেলাই ভালো, আমরা যে কজন এখানে উপস্থিত আছি, তার মধ্যে কে বা কারা আপনাকে হত্যার চেষ্টা করছে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।'

কথা শেষ করেই হলঘর ত্যাগ করলেন অনীশ চৌধুরী ও চন্দন দেবনাথ। বাকি কজন তখন স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেবনাথের কথার রেশ তখনও প্রত্যেকের কানে বাজছে,—আমাদের মধ্যেই কে বা কারা।—কে? কে? প্রত্যেকের মনেই এই একটি প্রশ্ন।

রবিশঙ্কর বর্মা নিজের ঘরে পায়চারি করছিলেন। তিনি এখনও বুঝতে পারছেন না কে বা কারা তার বিরুদ্ধে এই জটিল চক্রান্ত গড়ে তুলছে। চিন্তায় তার চোখের কোল একটু বসে গেছে। তিনি একটু আগে দীনেশ সিং মারফত অনীশ চৌধুরীকে পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছেন। কে জানে,

মিস্টার চৌধুরী তাকে রক্ষা করতে পারবেন কিনা।

হঠাৎ কার পদশব্দে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, ঘরে প্রবেশ করেছে সোমেশ দত্ত। 'হ্যালো, সোমেশ। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রবি বর্মা।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর সোমেশ দত্তর।

ঘরের আবহাওয়া নিমেষে ভারী হয়ে উঠল।

'তাই নাকি? বোসো বোসো।' হাসির আমেজটা নষ্ট হতে দিতে চাইলেন না রবি বর্মা। তারপর নিজে একটা চেয়ার দখল করলেন।

সোমেশ দত্ত তখনই কিন্তু বসল না। সিধে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর এসে রবি বর্মার মুখোমুখি বসল।

'কী ব্যাপার, সোমেশ? রবিশঙ্কর বর্মা এবার উৎসুক, কিন্তু গম্ভীর।

'ব্যাপারটা একটু প্রাইভেট, মিস্টার বর্মা।' একটু ঝুঁকে পড়ে বলল সোমেশ দত্ত, 'অচলার সঙ্গে আমার বিয়েটা আগামী মাসে সেটল করছি, আশাকরি আপনার এতে সম্পূর্ণ মতো আছে। সে যাক, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনার একমাত্র ওয়ারিশন অচলা একা, না আর কেউ আছে?'

'এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর সোমেশ। একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর রবিশঙ্কর বর্মার।'

'মোটেই না—আমি অচলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমি দেখব যে, আপনি তার জন্য কী কী রেখে যাচ্ছেন!'

'ইউ-মিন, ইউ ওয়ান্ট টু নো দি উইল?'

'যদি বলি তাই?'

'নো—নেভার! আমার সম্পত্তি আমি যাকে খুশি দিয়ে যাব—তাতে তোমার কী?' প্রচণ্ড রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে রবি বর্মার।

'তাহলে, অচলাকে বিয়ে করে আমার লাভ কী?'

'লাভ? তুমি একটা ভদ্রঘরের সন্তান হয়ে একথা বলতে পারলে সোমেশ?' রবি বর্মা যেন বিস্ময়ে থ হয়ে গেছেন।

'হ্যাঁ, পারলাম। আমি সাফ জানতে চাই, আপনি অচলাকে কী বা কত দিয়েছেন?'

'নাথিং—নট এ সিঙ্গল পাইস।' রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন রবিশঙ্কর বর্মা। 'ইউ আর এ স্নেক—গেট আউট—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে!'

'ঠিক আছে।' উঠে দাঁড়িয়ে সোমেশ দত্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রবি বর্মার দিকে। তারপর দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গিয়ে একটানে দরজা খুলতেই—

ধপাস করে ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন দীনেশ সিং। তার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

'দীনেশ।'

'আজ্ঞে, স্যার—' দীনেশ সিং-এর কণ্ঠস্বর কাঁদো কাঁদো।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে তুমি?'

'কোথায় দাঁড়িয়ে স্যার?'

'দীনেশ, দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে কী করছিলে তুমি?'

'আজ্ঞে স্যার, মিস্টার চৌধুরী আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন, বিশেষ দরকার। তাই আমি ঘরে ঢুকতে যাব—'

'থামো,—সোমেশ, তুমি যেতে পারো। সোমেশ দত্তকে লক্ষ্য করে রবি বর্মা বললেন।

সোমেশ দত্ত এতক্ষণ সন্দেহের দৃষ্টিতে অবাক হয়ে দীনেশ সিং-এর দিকে চেয়েছিল, রবি বর্মার কথায় ও ঘুরে তাকাল। বলল, 'মিস্টার বর্মা, আমার নামও সোমেশ দত্ত! আমি এর শেষ দেখবই। তারপর লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সোমেশ দত্ত।

দীনেশ সিং কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, এনিথিং রং।'

'শাট আপ!' গর্জে উঠলেন রবি বর্মা। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

করিডরেই অনীশ চৌধুরীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল রবি বর্মার।

'মিস্টার বর্মা, আপনি নাকি আমাকে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন?'

'সে কী কথা? বরং দীনেশই আমাকে বলল যে, আপনি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী।' অবাক হলেন রবি বর্মা।

'অবাক কাণ্ড! মিস্টার সিংয়ের এ ব্যবহারের কারণ?'

'আমি এক্ষুনি দীনেশকে ডাকছি। এত সাহস ওর যে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে?'

এবার বাধা দিলেন অনীশ চৌধুরী, 'না মিস্টার বর্মা, লেট আস সি, অ্যাট হোয়াট হি ইজ আপ টু। আপনি এখন মিস্টার সিংকে কিছু বলবেন না, ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'তাই তো দিয়েছি মিস্টার চৌধুরী—আমি যেন মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। এরা সবাই মিলে আমাকে যেন সপ্তরথীর মতো ঘিরে ধরেছে। এই একটু আগেই সোমেশের সঙ্গে উইল নিয়ে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। আমি আর দেরি করব না, কালকেই আমার অ্যাটর্নি হরবিলাস সরকারকে ডেকে পাঠাব।'

'কিছু যদি মনে না করেন মিস্টার বর্মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' কুণ্ঠিতভাবে জানতে চাইলেন অনীশ চৌধুরী।

'না, না, মনে করব কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন মিস্টার চৌধুরী।' হাসলেন রবি বর্মা।

'দীনেশবাবু আপনার কাছে, ক'বছর ধরে কাজ করছেন?'

'তা প্রায় বারো-চোদ্দো বছর হল।'

'আর একটা প্রশ্ন—উইল করার ব্যাপারে আপনি কি কিছু ঠিক করেছেন?

'হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী। আমি আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই আমার ছোটভাই উমেশ বর্মাকে দিয়ে যাব।'

'আপনার কোনো ভাই আছে বলে জানি না তো।'

'হ্যাঁ, আমার এক ছোট ভাই আছে।'

'তবে তো খুবই মুস্কিলের—'

'আমি জানি মিস্টার চৌধুরী, অচলা, সোমেশ, দীনেশ, কীচক—এরা সবাই সম্পত্তির লোভে আমাকে আঁকড়ে আছে। কিন্তু আমি আপনাকে আমার যে সিদ্ধান্তের কথা বললাম, তার পেছনে গুঢ় কারণ আছে।'

'কারণটা আপত্তি না থাকলে যদি খুলে বলেন...'

'নিশ্চয়ই। আপনাকে আমি আমার জীবন রক্ষার ভার দিয়েছি, আর

আপনাকেই খুলে বলব না?—শুনুন,' রবিশঙ্কর বর্মা বলতে শুরু করলেন, 'আমার বাবা রণেন্দ্রনারায়ণ বর্মা আমার ঠাকুরদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। ঠাকুরদা মারা গেলে বাবাই সমস্ত সম্পত্তি পান। তখন চণ্ডীগড়ের জমিদারী দেখাশোনা করতেন বাবা নিজেই। তারপর তিনি সেখানেই বিয়ে করেন এক বাঙালির মেয়েকে। তাঁর দুই ছেলে হয়। একজন আমি আর ছোটজন উমেশ—উমেশচন্দ্র বর্মা। আমার বয়স যখন বাইশ বছর, তখন উমেশ এক সামান্য কারণে বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এর কয়েক বছর পর বাবার মৃত্যু হয়। ডাক্তার বলেছিলেন, বাবা হয়তো বা আরও কিছুদিন বাঁচতেন—কিন্তু ছেলের জন্য শক পেয়ে মারা গেলেন আরও আগে।

'আমার বাবা ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ। তিনি উমেশ চলে যাওয়ার পরই উইল পাল্টে সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে করে দেন। পরে মারা যাবার সময় উমেশের জন্য হয়তো তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। তাই একটা চিঠিতে আমাকে জানিয়ে যান যে, উমেশের যেন কোনোদিন কোনো অসুবিধা না হয়।

'এরপর আমি উমেশের অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু কোনো খোঁজ পাইনি। তাই আমি মরবার আগে সমস্ত কিছু ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যেতে চাই। উমেশ যদি আমি বেঁচে থাকতে ফিরে আসে, তবে বাবার নির্দেশ অনুযায়ী আমি সম্পত্তির অর্ধেক সঙ্গে সঙ্গে উমেশের নামে লিখে দেব। আপনি আমাকে কথা দিন মিস্টার চৌধুরী, আপনি আজ যা জানলেন, তা কাউকে কোনোদিন বলবেন না?'

'কথা দিলাম। আচ্ছা, চণ্ডীগড়ের জমিদারী কি শুধুমাত্র মিঃ সিংই দেখাশোনা করেন? আপনি যান না দেখতে?'

'আগে যেতাম, এখন আর যাই না।'

'আপনি এ-বাড়িতে এসেছেন ক'বছর?'

'তা প্রায় কুড়ি বছর হবে।'

'একটা ব্যক্তিগত কথা জিগ্যেস করব, মিস্টার বর্মা; কিছু মনে করবেন না—'

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রী—'

'মারা গেছেন। অচলার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান।'

'ভেরি স্যাড। আচ্ছা মিস্টার বর্মা, আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই এখানে?'

'না।'

'এত জায়গা থাকতে আপনি এই বিহারেই বা বাড়ি করলেন কেন?'

'মিস্টার চৌধুরী, এই বাড়ি আমার ঠাকুরদার আমলে তৈরি—উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা তা ভোগ করি। কিন্তু এটা কেউ বিক্রি করতে পারবে না—মানে দেবোত্তর সম্পত্তি।'

'মিস্টার বর্মা, আপনি কি উমেশ বর্মাকে খুঁজে বার করবার কোনো ব্যবস্থা করেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি হরবিলাসকে বলে রেখেছি যে, আমার ভালোমন্দ কিছু হলে ও যেন উমেশের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। উমেশ তো এতদিন এল না, আমার মৃত্যুর পর যদি আসে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে রবিশঙ্কর বর্মা বললেন।

'আপনি বার বার এই কথা ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন মিস্টার বর্মা। আমি তো বলেইছি যে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' আশ্বাস দেন অনীশ চৌধুরী, 'আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুনগে।'

রবিশঙ্কর বর্মা চলে গেলেন। এবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন অনীশ চৌধুরী—পাঁচটা বাজে। এর মধ্যেই অচলগড়ের ভেতর এখানে ওখানে অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন অনীশ চৌধুরী।

ঘরে পৌঁছে দেখেন চন্দন ঘরে নেই। একটু অবাক হলেন তিনি। এ সময় ও ফের গেল কোথায়? তাকে না জানিয়ে তো সাধারণত কোথাও যায় না! হঠাৎ অনীশ চৌধুরী দেখলেন কীচক এদিকে আসছে। ওকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার দেবনাথ কোথায় গেছেন, জানো?'

'না তো?

কোথায় যেতে পারে চন্দন? চিন্তা করতে লাগলেন অনীশ চৌধুরী।

নিস্তব্ধ নিঝুম হলঘরে প্রবেশ করলেন চন্দন দেবনাথ। আজ তিনি টর্চ আনতে ভোলেননি। হলঘর এর মধ্যেই ঘন অন্ধকারে ভরে গেছে। ঘরে ঢুকে বড় ভারী দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন তিনি।

তাঁর টর্চ নিঃসৃত সরু আলোর রেখা পূর্ববর্ণিত সেই বিশেষ কোণটির দিকে এগিয়ে চলল। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন দেবনাথ।

ওকি? পরমুহূর্তেই তাঁর হাতের আলো নিক্ষিপ্ত হল সেই বস্তুটির ওপর। ওহ্, সেই বর্মটা। এমনভাবে দাঁড় করানো যে, দেখে মানুষ বলেই মনে হয়। এবার কাজে হাত লাগালেন দেবনাথ। টর্চের আলো ফেলে দেওয়ালটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে লাগলেন তিনি। তাঁর মনে কোনো সন্দেহই নেই যে, ঠিক এইখানেই সম্পূর্ণ অদৃশ্য (?) হয়েছিলেন মিস অচলা বর্মা। হঠাৎই দেবনাথ দেওয়ালের কোণে জোড়ের মুখে একটা ধাতব বোতাম দেখতে পেলেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ওটা দেওয়ালেরই অংশ। সজোরে সেই বোতামটার ওপর চাপ দিলেন দেবনাথ। নিঃশব্দভাবে তাঁর সামনের ভারী পাথরের দেওয়ালে একটা দেড় ফুট চওড়া ফাঁকের সৃষ্টি হল। টর্চ হাতে করে মুহূর্তের দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠে সেই পথে প্রবেশ করলেন তিনি। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাথরের দেওয়াল পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে এল। দেবনাথ যদি প্রবেশ করার পূর্বমুহূর্তে পেছন দিকে তাকাতেন, তবে দেখতে পেতেন হলঘরের ভেজানো ভারী দরজা খুলে গেছে। আর সেখানে আকাশের পটভূমিকায় দণ্ডায়মান ছায়াময় একটি মানুষ।

ভেতরে সরু আর স্যাঁতসেতে একটা গলিপথ। এত সরু যে দুজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। টর্চের আলোর পথ দেখে দেখে এগোলেন দেবনাথ। কিছুদূর যাবার পর পথটা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে এল। তারপরই দেখা গেল একটা ঘর। ঘরটাকে ঘর না বলে ছোট কুঠরি বলাই যুক্তিসঙ্গত। সেই ঘরে একটি মাত্র গরাদ দেওয়া জানলা। একটা কেরোসিন ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ঘরটা আলোকিত। ঘরের এক কোণে কী একটা কুণ্ডলী পাকানো বস্তু।

এইবার পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন দেবনাথ। ধীরে ধীরে এগোলেন ওটাকে লক্ষ্য করে। কাছে গিয়ে দেখলেন—একজন মানুষ। লোকটির মুখে টর্চের আলো ফেললেন। ধড়মড় করে উঠে বসল লোকটি। চোখ পিটপিট করে তাকাতে লাগল। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখ ঢেকে গেছে। গায়ে শতচ্ছিন্ন একটি জামা। ঘরের অন্য কোনায় একটা কুঁজো আর মাটির গ্লাস। মেঝেটা নোংরায় ভর্তি। চন্দন দেবনাথ লক্ষ করলেন লোকটির পায়ে একটি লোহার বালা পরানো। আর সেটা শিকল দিয়ে পাথরের দেওয়ালে প্রোথিত একটি লৌহ কিলকের সঙ্গে সংযুক্ত।

'তোমার নাম কী?' প্রশ্ন করলেন দেবনাথ।

কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না।

'তুমি এখানে কেমন করে এলে?'

লোকটি নিশ্চুপ।

আরও কয়েকবার প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পেলেন না তিনি। তখন কী ভেবে ফিরে চললেন আগের পথ ধরে। টর্চের আলোয় পথ দেখে এগোতে লাগলেন দেবনাথ। সরু গলিপথের আধাআধি আসার পর হঠাৎই তাঁর টর্চ নিঃসৃত আলোর পথ রুদ্ধ হল। আলোর পথ রোধ করেছে কোনো ব্যক্তির পেশীবহুল মধ্যভাগ। টর্চের আলোটা একটু ওপরে ঘোরালেন দেবনাথ। আলো গিয়ে পড়ল লোকটির মুখের ওপর। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, পরনে একটি মাত্র ধুতি—মালকোঁচা মেরে পরা।

চন্দন দেবনাথের সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে কীচক। তার হাতে একটা ভারী লোহার রড।

বারান্দার বড় দেওয়াল ঘড়িতে প্রায় সাড়ে সাতটা। অন্ধকারে বারান্দার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সোমেশ দত্ত আর অচলা বর্মা।

'অচলা, ব্যাপার খুবই ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে।' সোমেশ দত্ত একটু উৎকণ্ঠিতভাবে বলল।

'কেন?' প্রশ্ন করলেন অচলা বর্মা।

'ঘণ্টা কয়েক আগে বুড়োর সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গেছে। বুড়ো বললাম বলে রাগ কোরো না—বুড়ো শকুনই বলা উচিত ছিল আমার।'

'কী নিয়ে?' আবার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাইলেন অচলা বর্মা।

'সম্পত্তি।' রুষ্টস্বরে জবাব দিল সোমেশ দত্ত, 'আমি শুধু উইলের সারমর্ম জানতে চেয়েছিলাম, তাতে মিস্টার বর্মা আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। দীনেশ সিং—ম্যানেজার দীনেশ সিং আড়িপেতে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। আমি একটানে দরজা খুলতেই তিনি হুমড়ি খেয়ে ঘরের ভেতর এসে পড়ে যান।'

'ভারি অদ্ভুত তো!' আশ্চর্য হন অচলা বর্মা।

'হ্যাঁ। আমার মনে হয়, হি ইজ এ ব্ল্যাকমেলার। আমি এটা বুঝতে পারছি না যে, মিস্টার সিং এতদিন ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করলেন কেমন করে?'

'সত্যিই, উনি কিন্তু অনেক পুরোনো লোক।'

'আচ্ছা, তোমার কাকা, উমেশ বর্মার কোনো হদিশ পাওনি তোমরা?' জানতে চাইল সোমেশ দত্ত।

'একদমই না। বাবার কাছে শুনেছি, তিনি নাকি গৃহত্যাগী হবার আগে বলেছিলেন যে, বাবার মৃত্যু না হলে তিনি এই অচলগড়ে পদার্পণ করবেন না।'

'অচলা, আমার মনে হয় আমাদের চারদিকে একটা জটিল চক্রান্তের জাল গুটিয়ে আসছে। আমার এখানে আর ভালো লাগছে না, চলো আমরা এই অচলগড় ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।'

'কিন্তু বাবার অনুমতি ছাড়া সেটা যে সম্ভব নয় সোমেশ।'

'ওহ্,—হ্যাঁ, তোমাকে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি অচলা। আমি তোমার বাবাকে ঝগড়ার সময় যেই বলেছি যে, উইলের সারমর্ম না জানালে অচলাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অমনি তিনি রেগে ফায়ার হয়ে গেলে...কে?...কে?' একটা ছায়াকে সাঁৎ করে সরে যেতে দেখেই চিৎকার করে উঠল সোমেশ দত্ত। দৌড়ে গেল সেটাকে লক্ষ্য করে।

ছায়ামূর্তিটি তখন সামনে এগিয়ে এসেছে। তাঁকে দেখেই চমকে উঠল সোমেশ দত্ত—দীনেশ সিং।

'মিস্টার সিং, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।' রাগত কণ্ঠস্বর সোমেশ দত্তর।

'আজ্ঞে, বলুন।' অতীব বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন সিংজী।

'আপনি এমন চোরের মতো আড়িপেতে কথা শোনার চেষ্টা করেন কেন?'

'কই? না তো! এই একটু বারান্দায় ঘুরছিলুম, হঠাৎই—

'চমৎকার!—আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেছেন?'

এই প্রশ্নে প্রসঙ্গের এতখানি পরিবর্তন দেখে থতমতো খেয়ে গেলেন দীনেশ সিং। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, 'আজ্ঞে স্যার—কী যে বলেন—' বলতে বলতে হাঁটা দিলেন।

'থামুন, যাচ্ছেন কোথায়?' সোমেশ দত্ত হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল দীনেশ সিংকে, 'জবাব দিন আমার প্রশ্নের।'

'ভগবানের আশীর্বাদে দুটি ছেলেমেয়ে আছে।' ইতস্তত করে জবাব দিলেন দীনেশ সিং।

'বউ আর ছেলেমেয়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবেন। কোনো আপত্তি শুনব না।'

'ঠিক আছে স্যার, তাই হবে।' কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলেন দীনেশ সিং।

সোমেশ দত্ত এবার অচলা বর্মার দিকে ফিরল। বলল, 'অচলা, আমার প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারলে?'

'একদম না।'

'আমার ধারণা দীনেশ সিং মিথ্যা কথা বলছে—তাই বললুম বউ আর ছেলেমেয়েদের কালই দেখতে চাই। মিস্টার সিং যদি বলতেন যে তিনি অবিবাহিত, তবে তোমার বাবা তাঁকে ইমিডিয়েটলি ডিসচার্জ করতেন। কেন জানো?'

'কেন?' আশ্চর্য হন অচলা বর্মা।

'তোমাকে বিয়ে করার চান্স নেবেন বলে।' হেসে উঠল সোমেশ দত্ত।

'বাজে বোকো না—অসভ্য কোথাকার।' হাসি চাপতে গিয়েও ফিক করে হেসে ফেললেন অচলা বর্মা। ঠিক এই সময় ভেসে এল একটা আর্ত চিৎকার। কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই দ্বিতীয় চিৎকার, তারপরই সব নিশ্চুপ।

হুড়মুড় করে দৌড়ে এলেন রবিশঙ্কর বর্মা, অনীশ চৌধুরী, দীনেশ সিং।

সোমেশ আর অচলাকে দেখে প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী, 'মিস্টার দত্ত, চিৎকারটা এল কোন দিক থেকে?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্টার চৌধুরী। অচলা, তুমি?'

'আমিও ঠিক বলতে পারছি না।'

'মিস্টার দেবনাথ কোথায়? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না!' জানতে চাইলেন রবিশঙ্কর বর্মা।

এইবার দীনেশ সিং এগিয়ে এলেন; বললেন, 'চলুন স্যার, আমরা একটু খোঁজ করে দেখি—'

'সেই ভালো। চলুন, মিস্টার চৌধুরী, চলো, সোমেশ।' বললেন রবিশঙ্কর বর্মা।

'বাবা, আমিও যাব?'

'আয়—' বলে এগোলেন রবি বর্মা।

'আমি ছাদের দিকে যাচ্ছি।' বললেন অনীশ চৌধুরী।

'আমরা তবে হলঘরটা দেখি।' বলল সোমেশ দত্ত।

'চলো দীনেশ, আমরা নীচের তলাটা দেখি—'

দীনেশ সিংকে নিয়ে দৃঢ়পদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন রবিশঙ্কর বর্মা। সকলের মনেই একটা অস্বস্তির ভাব—যেন একটা সাংঘাতিক কিছু প্রত্যক্ষ করতে চলেছেন প্রত্যেকে।

কীচক দেখল, তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে চন্দন দেবনাথ। তার ডান হাতে টর্চ। দেবনাথ মুহূর্তের মধ্যে পাজামার পকেটে হাত গলিয়ে রিভলভারটা বার করে আনলেন। কিন্তু কীচককে তিনি ঠিক

এস্টিমেট করতে পারেননি। রিভলভার বার করে কীচককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'ঘটোৎকচ, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!'

নিমেষের মধ্যে কীচকের হাতের লোহার রড চন্দনের রিভলভারধৃত হাতে আঘাত করল। এইবার কীচক হিংস্র হাসি নিয়ে এগিয়ে এল দেবনাথের দিকে। চন্দন বুঝতে পারলেন যে এই স্বল্পপরিসর গলিতে কোলাকুলিটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; তাই ঘুরে দৌড় লাগালেন সেই ছাট কুঠরিটার দিকে। রিভলভারের কথা চিন্তাও করলেন না আর। গজেন্দ্রগমনে দেবনাথের উদ্দেশে এগোল কীচক। সে জানে, পালাবার আর কোনো পথ খোলা নেই।

ঘরে প্রবেশ করল কীচক। রিভলভারটা সে আর কুড়িয়ে আনেনি। কারণ এরকম একটি লোককে ছাতু বানাতে তার দুটো হাতই যথেষ্ট।

দেবনাথ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কীচকের দিকে—ঠিক যেন কোণঠাসা বেড়াল। কীচক রডটা ঘরের কোনায় ছুড়ে দিল। তারপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। দেবনাথকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কীচক। দেবনাথ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পলকের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করলেন তিনি এবং বাঁ-পায়ে কীচকের পিঠে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে কীচক গিয়ে আছড়ে পড়ল পাথরের দেওয়ালে। দেবনাথ ততক্ষণে অপরদিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং কীচকের রডটি কোণ থেকে হাতে তুলে নিয়েছেন।

ঘুরে দাঁড়াল কীচক। তার কপাল কেটে একটা ক্ষীণ রক্তের ধারা গাল গড়িয়ে নামছে। তাতে মুখটা আরও বীভৎস দেখাচ্ছিল। কীচক বুঝল, প্রতিপক্ষ ক্ষীণজীবি হলেও চতুর। তাই সে এবার দেবনাথের রডধরা হাতের দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

কীচক কাছে আসতেই দেবনাথ রডটা চালাতে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে ফেলেছে কীচক। তারপর রডটা এক হ্যাঁচকায় ছিনিয়ে নিয়ে দেবনাথকে পাঁজাকোলা করে ছুড়ে দিয়েছে মেঝেতে। মাটিতে আছড়ে পড়লেন দেবনাথ। চিৎ হয়ে শুয়ে লক্ষ্য করলেন, কীচক তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর একটু এগিয়ে তার পায়ের নাগালের মধ্যে আসতেই দুটো পা কীচকের পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েই, পা দুটো

দুদিকে ছড়িয়ে দিলেন। ভারসাম্য রাখতে না পেরে কীচক উল্টে পড়ল মেঝেতে।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন দেবনাথ। বাঁ-পা দিয়ে চেপে ধরলেন কীচকের ডান পা, আর দু-হাত দিয়ে চেপে ধরলেন তার বাঁ-পা'টা, তারপর মোচড়াতে লাগলেন একবার ডান দিকে, আরেকবার বাঁ-দিকে। যন্ত্রণায় কীচকের দেহটাও একই ছন্দে গড়াতে লাগল একবার এদিকে, একবার ওদিকে—

কীচক তার বাঁ-পা'টা আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুটা ভাঁজ করে এক ধাক্কা দিল সামনের দিকে। টাল সামলাতে না পেরে দেবনাথ আবার ছিটকে পড়লেন পাথরের দেওয়ালে। আর তক্ষুনি লোহার রডটা সবেগে কীচকের হস্ত-নিক্ষিপ্ত হয়ে তার দিকে ছুটে এল। চকিতে মাথা নিচু করলেন চন্দন এবং কীচক এগিয়ে আসবার আগেই রডটা সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কীচক কিছুটা সতর্কভাবে এগিয়ে আসছিল, এমন সময় কীচকের পেছনে কাকে উদ্দেশ্য করে চন্দন বলে উঠলেন, 'একী, মিস্টার বর্মা, আপনি?' ঘরে প্রবেশের গলিমুখটা কীচকের পেছনেই ছিল। তাই কে এল দেখবার জন্য সে ঘুরে তাকাতেই, দেবনাথের হস্তধৃত রডটি সজোরে নিপতিত হল কীচকের ব্রহ্মতালুতে। দেবনাথের এই চালে কাত হল কীচক। বিকট আর্ত চিৎকার করে গোড়াকাটা। কলাগাছের মতোই ভূপতিত হল সে। পড়ে কিছুক্ষণ নড়ল না, কিন্তু একটু পরেই অতিকষ্টে চোখ খুলে তাকাল কীচক, আর শেষবারের মতো একবার আর্ত চিৎকার করে উঠল।

দেবনাথ ভয় পেলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টা করলেন। কীচকের মাথাটা হেলে গিয়েছিল একপাশে। দেবনাথ গিয়ে নাড়ি দেখলেন, কিন্তু তখন সব শেষ।

এইবার দেবনাথ নিজের গায়ের রক্ত রুমাল দিয়ে মুছবার চেষ্টা করলেন। তারপর কী ভেবে কীচকের মৃতদেহটা টানতে টানতে নিয়ে বেরোতে যাবেন, হঠাৎ ঘরের তৃতীয় ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে এতক্ষণ এই মল্লযুদ্ধের নীরব সাক্ষী ছিল। দেবনাথ লক্ষ করলেন,

সে ইশারায় দেওয়ালের একটা জায়গার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সেদিকে এগিয়ে গেলেন দেবনাথ; দেখলেন সেখানেও একটি ধাতব নব। সেটা টিপতেই দেওয়াল দু-ফাঁক হয়ে গেল। তখন তিনি কীচকের দেহটা টেনে নিয়ে সেই পথে অদৃশ্য হলেন। বলা বাহুল্য যাবার আগে রিভলভার আর টর্চটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুললেন না। দেবনাথ বেরিয়ে যাবার পর দেওয়াল পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে এল।

মৃতদেহটা নিয়ে ছাদে পৌঁছলেন দেবনাথ। পরিশ্রমের ফলে এই শীতেও ঘেমে উঠেছেন তিনি। তারপর কীচকের দেহটাকে ছুড়ে দিলেন নীচের উঠোন লক্ষ্য করে। হাঁফাতে হাঁফাতে যেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, অমনি দেখেন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। মুখে বিস্ময় ও কৌতুক একসঙ্গে সহাবস্থান করছে।

তিনি অনীশ চৌধুরী।

সোমেশ দত্ত আর অচলা বর্মা দ্রুতপদে হলঘরে এসে পৌঁছলেন। তাড়াতাড়িতে আলো আনতে ভুলে গেছেন দুজনেই। অচলা, দরজাটা খুলে আমরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, নয়তো শেষকালে আমরাই বিপদে পড়ব হয়তো।' বললেন সোমেশ দত্ত।

'সেই ভালো,' জবাব দিলেন অচলা বর্মা। তারপর দুজনে মিলে দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্ধকারে কিছুই নজরে এল না।

'মিস্টার দেবনাথের কোনো বিপদ হয়নি তো?' প্রশ্ন করলেন অচলা।

'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কীচককে তো দেখছি না, সোমেশ।'

'সত্যিই তো। আমার এতক্ষণ খেয়াল হয়নি—কীচক গেল কোথায়? তবে কি—

হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন রবিশঙ্কর বর্মা ও দীনেশ সিং।

'আচ্ছা স্যার, আওয়াজটা এল কোনদিক থেকে?' নামতে নামতে প্রশ্ন করলেন দীনেশ সিং।

'সেটা তো আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না, দীনেশ।'

'মিঃ দেবনাথের কোনো খোঁজ নেই, তার ওপর আবার এই রহস্যময়

ঘটনা—' একটু ভীত স্বরে বললেন দীনেশ সিং।

রবিশঙ্কর বর্মা কোনো জবাব দিলেন না।

একতলার ঘরগুলো সব তালা দেওয়া। থামের গোড়ায় যে দু-চারটে হ্যারিকেন রাখা ছিল, তারই আলোয় উঠোনটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎই অদূরে কী লক্ষ্য করে দীনেশ সিং বলে উঠলেন, 'স্যার, ওখানে কী একটা পড়ে আছে!'

দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন দুজনে। কাছে গিয়েই চমকে উঠলেন। দেখলেন, অনাবৃত দেহে পড়ে আছে কীচক। তার মাথাটা প্রায় চৌচির হয়ে গেছে। তবুও মুখ দেখে চেনা যায়। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন রবিশঙ্কর বর্মা, তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতেই বললেন, 'দীনেশ, কুইক—ওপরে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনো!'

তড়িৎগতিতে দৌড়লেন দীনেশ সিং। একটু পরেই তিনি অনীশ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। দেখা গেল, পেছনে পেছনে আসছেন সোমেশ দত্ত ও অচলা বর্মা।

'কী হয়েছে, মিস্টার বর্মা?' এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী।

'মিস্টার চৌধুরী, কীচক—কীচক পড়ে আছে এখানে। কম্পিত কণ্ঠস্বরে জবাব দিলেন রবি বর্মা।

'দেখি—পরীক্ষা করলেন অনীশ চৌধুরী : 'ডেড!'

'কীভাবে মারা গেল, মিস্টার চৌধুরী?' জানতে চাইল সোমেশ দত্ত।

তখনি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রবিশঙ্কর বর্মাকে প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী, 'আর্ত চিৎকারটা যে কীচকেরই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই তো, মিস্টার বর্মা?'

'না, কোনো সন্দেহই নেই।' জবাব দিলেন তিনি।

'তার মানে, কীচক গলার স্বর বিকৃত করে মিহি গলায় কথা বলত?'

'সম্ভবত তাই।'

'মিস্টার বর্মা, আমার মনে হয়, কীচককে কেউ ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। যদি এটা আত্মহত্যা হতো, তবে পড়বার সময় কীচক

আর্ত চিৎকার করত না। আপনার মনে আছে, কেউ একজন আপনাকে এইভাবে মারবার চেষ্টা করেছিল, আর আপনি ভাগ্যবলে রক্ষা পান?'

'হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী; মনে আছে।'

'আমার মনে হয় কীচককে সেই হত্যা করেছে।'

'মিস্টার দেবনাথ কোথায়? তাকে যে দেখছি না।' উৎসুক হলেন দীনেশ সিং।

'তাই তো।' বললেন রবি বর্মা, 'কোথায় গেলেন তিনি?'

'চলুন মিস্টার বর্মা, দেবনাথকে খোঁজা যাক।' অনীশ চৌধুরীর প্রস্তাব।

'মিস্টার চৌধুরী, আমার মতে এখন পুলিশে খবর না দেওয়াই ভালো; কারণ এখনই প্রায় সোয়া আটটা বাজে, কে যাবে এখন চার মাইল দূরের পুলিশ স্টেশনে? তাছাড়া পুলিশ যদিও বা আসে, তাহলে আর কারো ঘুমোতে হবে না রাত্রে। বরং কাল সকালেই পুলিশে খবর দেওয়া যাবে। তুমি কী বলো সোমেশ?'

'ক্ষতি কি?' ছোট্ট জবাব সোমেশ দত্তর।

'আমারও কোনো আপত্তি নেই।' বললেন অনীশ চৌধুরী।

এবার সবাই মিলে ওপরে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেবনাথকে পাওয়া গেল। নিজের ঘরে বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন তিনি। অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন। এমনটি যেন কেউই আশা করেননি।

রবিশঙ্কর বর্মা গম্ভীরভাবে বললেন, 'এনিওয়ে মিস্টার চৌধুরী, আশাকরি ন'টায় আপনারা ডিনারে যোগ দেবেন। বলে নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন তিনি।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল অনীশ চৌধুরীর। গত সন্ধ্যায় পরিশ্রমের পর ঘুমটা বেশ ভালোই হয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে তিনি এলেন বারান্দায়। নীচের উঠোনের দিকে তাকালেন, কি বীভৎস দৃশ্য। লাশটা পড়ে আছে—ঠিক যেন উড়ন্ত চিলকে মুগুরের বাড়ি মেরে আছড়ে ফেলা হয়েছে মাটিতে।

একটু পরেই অনীশ চৌধুরীর কাছে দৌড়ে এলেন দীনেশ সিং ঃ 'মিস্টার চৌধুরী, বর্মাজীকে পাওয়া যাচ্ছে না!' চমকে উঠলেন অনীশ চৌধুরী ঃ 'সেকী!'

দুজনেই তড়িৎবেগে ছুটলেন রবি বর্মার শোবার ঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সে-ঘরে অচলা বর্মা ও সোমেশ দত্ত নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। ওঁদের দুজনকে দেখেই চুপ করে গেলেন। অনীশ চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দীনেশ সিংয়ের দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার সিং, আপনি আর একবার খোঁজ করুন ভালো করে। মিস্টার বর্মা তো আর উবে যেতে পারেন না!'

'ঠিক আছে, আমি ভালো করে আবার দেখে আসছি।' দীনেশ সিং নিষ্ক্রান্ত হলেন।

'মিস্টার দত্ত, আপনি কখন উঠেছেন?' সোমেশ দত্তকে লক্ষ্য করে অনীশ চৌধুরী বললেন।

এই কিছুক্ষণ আগে। আমাকে অচলাই গিয়ে বলল যে, মিস্টার বর্মা—তাঁর ঘরে নেই।'

'মিস বর্মা, আপনি কখন উঠেছেন?'

'সোমেশকে ডাকার মিনিট দশেক আগে। বাবাকে ডাকতে গিয়ে দেখি বাবা ঘরে নেই। তখন ভাবলাম, বাবা হয়তো বাথরুমে গেছেন। কিন্তু দেখলাম বাথরুমের দরজাও হাট করে খোলা—কেউ নেই সেখানে। তখন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে সোমেশকে ডেকে তুলি। তারপর তো আপনি সব জানেনই।'

এমন সময় দীনেশ সিংয়ের হৃদয়ভেদী চিৎকার ভেসে এল। সবাই দৌড়লেন চিৎকারের শব্দ লক্ষ্য করে। বারান্দা থেকে অনীশ চৌধুরী দেখলেন, দীনেশ সিং নীচের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখ দুটো মনে হয় এক্ষুনি ঠেলে বেরিয়ে আসবে। সবাইকে বারান্দায় দেখে তিনি হাতছানি দিয়ে নীচে আসবার আহ্বান জানালেন।

চিৎকারে চন্দন দেবনাথের ঘুমও ভেঙে গিয়েছিল। তিনিও সকলের সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। অনীশ চৌধুরীকে দেখে দীনেশ সিং বললেন,

'মাই গুডনেস! হোয়াট দি হেল ইজ গোয়িং অন হিয়ার?'

সকলেই দীনেশ সিংয়ের নির্দেশিত জায়গায় দৃষ্টিপাত করলেন।

কীচকের লাশ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! তার পরিবর্তে যে লাশ পড়ে আছে, সেটা রবিশঙ্কর বর্মার! ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। রবিশঙ্কর বর্মার পরনে শুধু একটা খাটো ধুতি। এছাড়া দেহ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে—ঠিক কীচকের মতোই। চোখের দৃষ্টিতে কারুণ্য ফুটে উঠেছে। জিভের ডগাটা কেটে গেছে, দাঁত একটু বেরিয়ে রয়েছে। জমাট রক্তের ওপর মাছি বসতে শুরু করেছে।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন অচলা। মৃতদেহের ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। সোমেশ দত্ত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

'কিন্তু গায়ের জামা-কাপড়গুলো গেল কোথায়?' স্বগোতক্তি করলেন চন্দন।

'তার চেয়েও যেটা বড় কথা,' বললেন অনীশ চৌধুরী, 'তা হল, কীচকের লাশটা গেল কোথায়? আশাকরি কাল রাতে আমরা দেখতে ভুল করিনি।'

অচলা বর্মা এবার উঠে ত্রস্ত পায়ে নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন, তার সঙ্গী হল সোমেশ দত্ত। ওরা চলে যাবার পর একটু ইতস্তত করে বললেন দীনেশ সিং, 'স্যার, পুলিশে কি খবর দেব?'

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তারপর খবর দেওয়া যাবে।' জবাব দিলেন দেবনাথ।

'ঠিক আছে স্যার, তাই হবে।' চলে গেলেন দীনেশ সিং।

এবার দেবনাথকে প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী, 'চন্দন, তোমার কি মনে হয়?'

'অনীশদা,' বললেন দেবনাথ, 'হত্যাকারী আমাদের ধোঁকা দিতে চাইছে। তবে কতক্ষণ পারবে সেটাই প্রশ্ন।'

'কীচকের লাশটা কোথায় লুকোনো যেতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'কী করে বলি? এ-বাড়িতে লুকোবার প্রচুর জায়গা আছে।'

'কীচকের লাশ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।' দৃঢ়স্বরে বললেন অনীশ চৌধুরী, 'চলো, আপাতত ওপরে যাওয়া যাক।'

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে আরম্ভ করলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা ধরে অচলা বর্মার ঘরের দিকে এগোলেন অনীশ ও চন্দন। গিয়ে দেখেন, অচলা নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। সোমেশ দত্ত পাশেই একটা সোফায় বসে আছে, হাতে একটা সায়েন্স ম্যাগাজিন। ওঁদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সোমেশ দত্ত পত্রিকাটা রেখে উঠে দাঁড়াল।

'মিস্টার সিং কোথায়?' প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী।

'একটু আগে বারান্দায় দেখলাম।—আচ্ছা, আমি ডেকে আনছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সোমেশ দত্ত।

চন্দন দেবনাথ এবার উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর অচলা বর্মার কাছে এসে বসলেন, 'মিস বর্মা, দয়া করে সেদিন রাতের ঘটনাটা বলবেন কি?'

চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন অচলা বর্মা, কোন রাতের ঘটনা?'

'মনে করবার চেষ্টা করুন, তবেই মনে পড়বে।' দেবনাথের মিছরি মাখা কণ্ঠস্বর।

'আমি—আমি জানি না।' নিজের দৃঢ় ভাবটাকে বজায় রাখতে চাইলেন অচলা বর্মা।

'তার মানে, বলবেন না? ঠিক আছে।'

মাথা নিচু করে বসে রইলেন অচলা বর্মা। এইবার প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী, 'উমেশ বর্মাকে আপনি কোনোদিন দেখেছেন?'

'না।'

'তবে তিনি যদি আসেন, তো তাকে চিনবেন কেমন করে?'

'বাবা অনেক আগে বলেছিলেন যে, হরবিলাস সরকারের কাছে উমেশ কাকার শরীরের এমন কতগুলো চিহ্নের কথা লেখা আছে, যার সাহায্যে তাকে চিনতে কোনো অসুবিধেই হবে না।'

এমন সময় ঘরে ঢুকল সোমেশ দত্ত, সঙ্গে দীনেশ সিং।

'এই যে দীনেশ সিং, কোথায় গিয়েছিলেন?' জানতে চাইলেন অনীশ চৌধুরী।

'না—মানে—স্যার, এই একটু ছাদের হাওয়া খেতে।' কোনো রকমে জবাব দিলেন দীনেশ সিং।

এইবার চটে গেল সোমেশ দত্ত, প্রায় ভেংচিয়ে বলে উঠল, 'হাওয়া খেতে? মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পান না?' তারপর অনীশ চৌধুরীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, আমি মিস্টার সিংকে খুঁজতে খুঁজতে যেই ছাদে গিয়ে পৌঁছেছি, দেখি মিস্টার সিং উবু হয়ে বসে কী দেখছেন। আমাকে দেখেই কী একটা পকেটে রেখে চটপট উঠে এলেন—আর এখন ন্যাকা সাজছেন?'

'মিস্টার সিং, দেখি আপনার পকেটে কী?' উৎসুক হলেন দেবনাথ।

'কিছুই না স্যার, শুধু একটা রুমাল।'

হঠাৎই সোমেশ দত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনেশ সিংয়ের ওপর। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দীনেশ সিংয়ের একটা সর্টকাট ঘুঘুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী হতে হল সোমেশ দত্তকে। অনীশ চৌধুরীর বললেন, 'মিস্টার সিং, জিনিসটা আমরা দেখবই—নাথিং ক্যান প্রিভেন্ট আস।'

'অল রাইট, এই দেখুন তবে। পকেট থেকে যে বস্তুটি বার করলেন দীনেশ সিং, সেটা একটা আতস কাচ।

'এর মানে কী?'

'দিস মিনস,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন দীনেশ সিং, 'আই অ্যাম অ্যান এজেন্ট অফ সি-বি-আই—অবশ্যই পাঞ্জাব ব্রাঞ্চের।'

'সেকী!' যার-পর-নাই আশ্চর্যান্বিত হল সোমেশ দত্ত।

—হ্যাঁ, এই যে আমার আইডেনটিটি কার্ড।' দীনেশ সিং কার্ডটা বাড়িয়ে দিলেন অনীশ চৌধুরীর দিকে।

হাতে নিয়ে দেখলেন তিনি, তারপর ফিরিয়ে দিলেন কার্ডটা। বললেন, 'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি।'

এইবার দীনেশ সিং তার নকল গোঁফ, ভুরু আর চশমা খুলে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আমার নাম দীনেশ সিং নয়, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। মাই নেম ইজ কিষাণ আপ্তে, বাট আই অ্যাম নোন

টু এভরিবডি অ্যাজ এজেন্ট জেড।'

'আমাকে মাপ করবেন মিস্টার আপ্তে, সোমেশ দত্ত অনুতপ্ত স্বরে জানাল, 'আমি আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম।'

'না, না, দোষ তো আমারই।' হাসতে হাসতে বললেন কিষাণ আপ্তে।

'আপনি হঠাৎ এইখানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন অনীশ চৌধুরী।

'আমি এখানে এসেছি উমেশ বর্মার অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতে।' বলতে শুরু করলেন কিষাণ আপ্তে, 'শোনা যায়, রবিশঙ্কর বর্মা নাকি উমেশ বর্মাকে গুম করে রেখে দিয়েছিলেন; কারণ, যদি উমেশ বর্মা সম্পত্তির বখরা চান, তাই। আমাকে এর তদন্ত করতে পাঠানো হয়। আরও একটা কারণ এর পেছনে আছে, তা হল উমেশ বর্মা এক সময় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে ছিলেন।'

'আমি দীনেশ সিংকে সব খুলে বলে অনুরোধ করি। তিনি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজি হন। তখন আমি দীনেশ সিংয়ের ছদ্মবেশে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। তারপর মাস ছয়েক হল নানান ছুতো করে এখানে থেকে গেছি। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু রহস্য সমাধান তো হলই না, উপরন্তু মিস্টার বর্মা খুন হলেন।

'শেষ দিকে মিস্টার বর্মা আপনাকে আনালেন তাকে রক্ষা করার জন্য। আমার মনে হয় উমেশ বর্মা তার দাদার কবল থেকে কোনো রকমে পালাতে পেরেছেন—আর আক্রোশবশত মিস্টার বর্মাকে খুন করে প্রাসাদের ছাদ থেকে ফেলে দেন। কারণ মিস্টার বর্মার গলায় আমরা আঙুলের দাগ পেয়েছি।

'যা হোক, আমি আশাকরি এ রহস্যের সমাধান আমরা করতে পারব। আমি একটু আগেই পুলিশে খবর দিয়েছি—আর সেই সঙ্গে হরবিলাস সরকারকেও।'

কিষাণ আপ্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন এক প্রৌঢ়—প্রায় ষাট বছর বয়স হবে। লম্বা ঝাঁটা গোঁফ, ছুঁচলো দাড়ি, সাহেবি পোশাকে মোড়া দেহ। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

তিনি ভেতরে আসবার অনুমতি চাইলেন, 'মে আই কাম ইন? আমার নাম হরবিলাস সরকার মিস্টার রবিশঙ্কর বর্মার অ্যাটর্নি।'

'নিশ্চয়ই—আসুন ভেতরে।' উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কিষাণ আপ্তে।

ঘরে এসে বসলেন হরবিলাস সরকার।

অচলা বর্মা ততক্ষণে সামলে উঠেছেন। তিনিই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিস্টার সরকার, আসুন প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিই আপনার। ইনি শ্রীঅনীশ চৌধুরী ও তার বন্ধু চন্দন দেবনাথ—এরা এসেছিলেন বাবার প্রাণ-রক্ষার জন্য। আপনি তো জানেনই যে, এর আগে তিন-তিনবার কেউ বাবার প্রাণ হরণের চেষ্টা করেছিল, বাবা তাই এদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ইনি মিস্টার আপ্তে, সি-বি-আইয়ের লোক। ইনি এতদিন ছদ্মবেশে, গোপনে উমেশ কাকার 'হঠাৎ অন্তর্ধান রহস্য' ভেদ করার চেষ্টায় ছিলেন। আর—আর এ হল সোমেশ দত্ত—এ ফ্রেন্ড ইন নিড।

'বুঝেছি।' মৃদু হাসলেন হরবিলাস সরকার। 'ওকালতি করেই তো তিরিশটা বছর পার করলুম। যা হোক, এবার কাজের কথায় আসা যাক। প্রথম কথা হল, মিস্টার বর্মা উইল করে যেতে পারেননি—কিন্তু আমার কাছে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আপনাদের কাউকে তিনি কিছু বলেছেন কি? জানতে চাইলেন হরবিলাস।

'আমাকে তিনি বলেছিলেন।' অনীশ চৌধুরী উত্তর দিলেন, 'তবে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। আমি সেকথা এখন বলব, কারণ মিস্টার বর্মা এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তিনি চেয়েছিলেন যে তার সমস্ত সম্পত্তি স্থাবর-অস্থাবর যেন শ্রীউমেশ বর্মাকে দেওয়া হয়। থামলেন অনীশ চৌধুরী।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠল সোমেশ দত্ত, 'হোয়াট? এ সম্পূর্ণ অসম্ভব!'

'কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেটাই সম্ভব

হয়েছে।' আড় চোখে একবার সোমেশ দত্তর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন হরবিলাস, 'মিস্টার বর্মা আমাকে একথা যে শুধুমাত্র মুখে বলেছিলেন তা নয়, তিনি নিজের হাতে লিখে সে ইচ্ছা প্রকাশও করে গেছেন; এই দেখুন সেই চিঠি। হরবিলাস সরকার চিঠিটা বাড়িয়ে দিলেন অচলা বর্মার দিকে।

কিন্তু সেটা মাঝপথেই ছিনিয়ে নিলেন চন্দন দেবনাথ, তারপর উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুরু করলেন ঃ

হরবিলাস,

এই চিঠিটা তোমার কাছে রেখে দেবে। আমি ঠিক এখনই উইল করতে চাই না; অচলা ও সোমেশকে কিছু দেব কিনা সেটা চিন্তা করতে চাই। তুমি তো জানো, আমার অবর্তমানে এসব সম্পত্তির মালিক আমার স্নেহের ছোট ভাই উমেশ। বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল উমেশ যেন অর্ধেক সম্পত্তি পায়, কিন্তু তিনি তা কাগজে-কলমে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার আকস্মিক মৃত্যু হলে তুমি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উমেশের খোঁজ করবে ও সব কিছু তার হাতেই তুলে দেবে। আমার মনে হয় ও অচলামাকে বঞ্চিত করবে না।

—রবিশঙ্কর বর্মা

অনীশ চৌধুরী চিঠিটা দেবনাথের হাত থেকে নিলেন। তারপর হাতের লেখাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন ভালো করে। তারপর চিঠিটা মিস্টার সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

'তার মানে, বললেন অনীশ চৌধুরী, 'মিস্টার সরকার, এখন আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে সবক'টি কাগজে উমেশ বর্মার খোঁজ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া।'

'হ্যাঁ, সেটাই করতে হবে। তাছাড়া আর উপায় কি?'

এমন সময় উঠে দাঁড়ালেন কিষাণ আপ্তে। বললেন, 'মনে হয় নীচে কেউ এসেছে—আমি একবার দেখে আসছি। ঘরের বাইরে তার পদশব্দ

মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই উঠে দাঁড়ালেন চন্দন দেবনাথ, 'অনীশদা, আমি একটু আসছি—এক্সকিউজ মি। বেরিয়ে গেলেন দেবনাথ।

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি হলঘরের দিকে চললেন। আগেকার নির্দিষ্ট স্থানে এসে সেই ধাতব নবটিতে চাপ দিলেন। সামনের দেওয়াল দু-ফাঁক হয়ে গেল। চন্দন অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দেওয়াল আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। পূর্ববর্ণিত সেই গলিপথ ধরে দেবনাথ এগিয়ে চললেন। যখন তিনি সেই কুঠরিতে প্রবেশ করলেন, তখন দেখলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছে—ঘরে কেউ নেই। বেড়ির শিকল কাটা এবং জানলার গরাদ খোলা।

দেবনাথ গরাদগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। বেশ সরু। বেড়ির শিকলটা মনে হল করাত দিয়ে কাটা। জানলার কাছে এগিয়ে এলেন চন্দন। ওদিকটায় জঙ্গল মতো। এটাই সম্ভবত প্রাসাদের পেছন দিক। ঘরটার এখানে ওখানে একটু দেখলেন, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চন্দন।

হলঘর থেকে বেরোতে যেতেই তার চোখ পড়ল প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, পোশাক ইত্যাদির দিকে। চোখ ফিরিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েই আবার কী মনে করে চোখ ফেরালেন। তার দৃষ্টি আটকে গেল। আরে—একী! একটা অর্ধ স্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। ওটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ঢুকলেন কিষাণ আপ্তে। সঙ্গে ইন্সপেক্টর সুরিন্দর কাপানি আর চারজন কনস্টেবল।

'আসুন ইন্সপেক্টর, আসুন।' উঠে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী।

এগিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন ইন্সপেক্টর কাপানি। পারস্পরিক আলাপ পরিচয় সেরে নিলেন সকলে। তারপর তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন অনীশ চৌধুরী ও কিষাণ আপ্তে।

সব শোনার পর কাপানি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা মিস্টার চৌধুরী,

লাশ বদল করার পেছনে, কী উদ্দেশ্য আছে বলে আপনি মনে করেন?'

'ঠিক বলতে পারছি না ইন্সপেক্টর। হতাশ কণ্ঠস্বর অনীশ চৌধুরীর।

'মিস্টার আপ্তে,' বললেন সুরিন্দর, 'আপনি আমাকে যদি সাহায্য করেন তবে খুবই ভালো হয়।'

'যতখানি আমার ক্ষমতা, ততখানি সাহায্য নিশ্চয়ই করতে রাজি আছি।' জবাব দিলেন কিষাণ আপ্তে।

'তবে কাইন্ডলি আর একবার বলুন, আপনি এখানে কীসের তদন্তে এসেছেন?'

'উমেশ বর্মাকে খুঁজে বার করতে। আমার ধারণা রবিশঙ্কর বর্মা উমেশ বর্মাকে গুম করে রেখেছিলেন।'

'ভেরি অ্যাশটনিশিং।' অবাক হলেন কাপানি, 'আপনি কী বলতে চান, উমেশ বর্মাকে এ-বাড়িতেই গুম করে রাখা হয়েছে?'

'এছাড়া আর কোথায় হতে পারে?' এবার উত্তর দিলেন অনীশ চৌধুরী। 'কারণ সর্বদা চোখে চোখে রাখতে গেলে নিজের বাড়িই উৎকৃষ্ট স্থান নয় কি? অবশ্য যদি মিস্টার আপ্তের ধারণা সত্যি হয়।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন চন্দন দেবনাথ, 'অনীশদা, এক্ষুনি সবাই একবার আসুন।'

'কী ব্যাপার?'

কোনো জবাব দিলেন না দেবনাথ, দ্রুতবেগে অদৃশ্য হলেন হলঘরের দিকে। আর সবাই তাকে অনুসরণ করলেন।

হলঘরে পৌঁছে দেবনাথ বললেন, 'মিস্টার আপ্তে, একজন বন্দি এ-বাড়িতে ছিল—'

'ছিল? 'ছিল' বলছেন কেন?' কিষাণ আপ্তে উৎকণ্ঠিত।

'তার মানে অতি প্রাঞ্জল—এখন আর নেই।'

'কে সে?'

'আমি প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু কোনো জবাব পাইনি।'

'মিস্টার চৌধুরী, দেখলেন তো যে আমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি?'

'তাই তো দেখছি, মিস্টার আপ্তে।' চিন্তিত স্বরে বললেন অনীশ চৌধুরী।

ইতিমধ্যে দেবনাথ গুপ্তদ্বার খুলে ফেলেছেন। একে একে সবাই তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সমস্ত কিছুই দেখলেন সবাই। প্রথমে মুখ খুললেন অনীশ চৌধুরী, 'তার মানে লোকটি পালিয়েছে।'

সুরিন্দার কাপানি একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে বললেন, 'তাহলে মিস্টার বর্মার হত্যাকারী সম্বন্ধে আঁচ পাওয়া যাচ্ছে না কি?'

'আপনি বলতে চান যে, এই বন্দি লোকটি কোনো রকমে ছাড়া পেয়ে মিস্টার বর্মাকে খুন করে ছাদ থেকে ফেলে দেয়—তারপর পালায়?'

প্রশ্ন করলেন অনীশ চৌধুরী, 'কিন্তু তাকে বন্ধনমুক্ত হতে সাহায্য করবে কে?'

'কেন? মিস অচলা বর্মা।' দেবনাথের আওড়ানো শব্দগুলো যেন এক-একটা ঝাপটার মতো গিয়ে লাগল প্রত্যেকের কানে।

খেপে উঠল সোমেশ দত্ত, 'কী বলতে চান আপনি?'

'বলতে চাই যে এই বন্দির পরিচয় মিস বর্মা জানেন, আর তিনি এই বন্দিকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার দিয়ে যেতেন—'

'ইজ ইট?' ঘুরে দাঁড়ালেন কাপানি।

'বন্দির পরিচয় আমাদের জানা দরকার মিস বর্মা!' অনুরোধ করলেন আপ্তে।

কিন্তু অচলা বর্মা নিশ্চুপ।

'চলুন, সবাই বাইরে যাওয়া যাক।' সোমেশ দত্ত বলল।

আবার সবাই হলঘরে এসে দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক দেখে দরজার দিকে পা বাড়ালেন প্রত্যেকে।

'ওয়ান মিনিট প্লিজ, জেন্টেলমেন।'

চন্দন দেবনাথের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সবাই।

'দেয়ার ইজ ওয়ান মোর স্টান্ট ফর ইউ।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁ-পায়ে এক লাথি মারলেন মানুষ-প্রমাণ বর্মটার গায়ে। স্থানচ্যুত হয়ে উল্টে পড়ল সেটা। হাত-পায়ের জোড় খুলে একটা মানুষের হাত আর পা বাইরে বেরিয়ে এল।

অতঃপর বর্মটা খোলার কাজে হাত লাগালেন কাপানি এবং কিষাণ

আপ্তে। পুরোপুরি খোলা হলে দেখতে কারো আর অসুবিধা হল না। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কীচক নয়—কীচকের মৃতদেহ। চোখ দুটো সোজাসুজি ওপর পানে তাকিয়ে।

'আর একটা খুন!' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন হরবিলাস সরকার।

হ্যাঁ, আর একটা খুন! জোরালো কণ্ঠে বললেন অনীশ চৌধুরী, 'সে খুন হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু লাশটা পাওয়া গেল পরে। চলুন, মিস্টার বর্মার ঘরে যাওয়া যাক।'

আবার সবাই রবিশঙ্কর বর্মার ঘরের দিকে চললেন।

হঠাৎ কী মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়ালেন দেবনাথ, 'ইন্সপেক্টর, আপনি কি মিস্টার বর্মার লাশ দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, বাড়িতে ঢুকেই দেখেছি।' বললেন কাপানি। তারপর কনস্টেবলদের নির্দেশ দিলেন লাশ দুটো গাড়িতে তুলতে।

'কবে নাগাদ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে, মিস্টার কাপানি?' জানতে চাইলেন কিষাণ আপ্তে।

'আশাকরি কালই। যদি না হয় তো পরশু।'

রবিশঙ্কর বর্মার ঘরে এসে বসলেন সকলে। অনীশ চৌধুরী এবার বললেন, 'জবানবন্দীগুলো সেরে নিতে পারতেন ইন্সপেক্টর।'

'সেই ভালো।' সোমেশ দত্তর দিকে ফিরলেন কাপানি। 'মিস্টার দত্ত, আমি কোনো প্রশ্ন করতে চাই না। শুধু আপনি যতটা জানেন, আমাকে বলুন।'

সব বলে গেল সোমেশ দত্ত; কোনো কথাই বাদ দিল না।

সোমেশ দত্তর কথা শেষ হলে সবাই তাকাল অচলা বর্মার দিকে।

যে প্রশ্নটা সবাইয়ের মনেই জাগ্রত হয়েছে, সেটাই করে বসলেন সুরিন্দার কাপানি। বললেন, 'মিস বর্মা, দয়া করে বলুন তার পরিচয়। নয়তো আপনার পিতার নৃশংস হত্যার কোনো সমাধানেই আমরা পৌঁছতে পারব না। চুপ করে থাকবেন না মিস বর্মা।'

তবুও চুপ করে রইলেন অচলা বর্মা।

'বলে দাও অচলা, চুপ করে থেকো না।' অনুরোধ করল সোমেশ দত্ত।

এইবার মুখ খুললেন অচলা বর্মা। বললেন, 'বন্দি হলেন, উমেশ বর্মা—উমেশ কাকা। বাবা ওঁকে আটকে রেখেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, উমেশ কাকা নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করিনি। বাবা কীচককে রেখেছিলেন উমেশ কাকাকে পাহারা দেবার জন্য। উমেশ কাকা এমনিতে বেশি কথা বলতেন না। আমি তাকে লুকিয়ে খাবার দিতে যেতাম, বাবা জানতেন না। এখন দেখলাম উমেশ কাকা পালিয়েছেন। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি তাকে পালাতে সাহায্য করিনি। কে করেছে, তাও জানি না। কিন্তু ইন্সপেক্টর, বাবাকে কে খুন করল, তা আমি বুঝতে পারছি না। কে?—কে?' কান্নায় ভেঙে পড়লেন অচলা বর্মা।

'এর উত্তর পেতে আমাদের দেরি হবে না, মিস বর্মা।' শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন সুরিন্দার কাপানি, 'বিশেষ করে আরও তিনজন স্পেশালিস্ট যখন উপস্থিত আছেন, আই মিন, মিস্টার অনীশ চৌধুরী, মিস্টার চন্দন দেবনাথ অ্যান্ড মিস্টার কিষাণ আপ্তে।'

তিনজনেই মৃদু হাসলেন।

'আমি তাহলে কালকের কাগজেই বিজ্ঞাপন দেব ভাবছি।' ইতস্তত করে বললেন হরবিলাস সরকার, 'যদি হঠাৎ খোঁজ পেয়ে যাই উমেশ বর্মার।

'দেখুন চেষ্টা করে।' বললেন অনীশ চৌধুরী, 'তবে সকলের ধারণা অনুযায়ী উমেশ বর্মা যদি খুনি হন, তবে তো তার ফিরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি বন্দি ছিলেন তিনি উমেশ বর্মা নন।'

অচলা বর্মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছেন আপনি মিস্টার চৌধুরী!'

'ঠিক বলছি। আপনারা একটু ভেবে দেখুন, যেখানে উমেশ বর্মা এমনিতেই সব সম্পত্তি পাচ্ছেন, সেখানে তিনি রবিশঙ্কর বর্মাকে খুন

করে এতটা ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? তিনি তো এমনিতেই পালাতে পারতেন। পারতেন পরে আইনের সাহায্য নিতে। কেন? কেন তা হল না? তাই আমার ধারণা, আমরা ভুল পথে চলেছি। চলেছি না—কিন্তু চালিত হচ্ছি—হত্যাকারীর দ্বারা চালিত হচ্ছি। তাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। উমেশ বর্মা আমার মতে হত্যাকারী নন—কারণ নিশ্চয়ই আপনাদের বোঝাতে পেরেছি আমি?'

'মিস্টার চৌধুরী, এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই।' হরবিলাস সরকার বললেন, 'যদি উমেশ বর্মা হত্যাকারী হন, তবে বিজ্ঞাপন দেখে তিনি কখনোই আসবেন না। যদি তিনি আপনার ধারণা অনুযায়ী নির্দোষ হন, তবে তিনি মনে হয় আসবেন—যদি অবশ্য বিজ্ঞাপনটি তার চোখে পড়ে। এটা সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। একটু দম নিয়ে থামলেন হরবিলাস সরকার।

'আপনার ধারণা অনেকাংশে সত্যি মিস্টার সরকার। অনীশ চৌধুরী বললেন, আপনি দেখবেন যত তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনটা দেওয়া যায়। বিজ্ঞাপনে দয়া করে সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করবেন।'

'আচ্ছা, আজ তবে আসি। নমস্কার।' বিদায় নিলেন হরবিলাস সরকার।

এবার ইন্সপেক্টর কাপানিও তার দলবল নিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রওনা হলেন। ঘরে রইলেন অচলা বর্মা, সোমেশ দত্ত, অনীশ চৌধুরী, চন্দন দেবনাথ ও কিষাণ আপ্তে।

'মিস্টার আপ্তে,' বললেন অনীশ চৌধুরী, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে—কাইন্ডলি যদি আমার ঘরে একটু আসেন।'

'ওহ্, সিওর—চলুন।' এগিয়ে এলেন কিষাণ আপ্তে।

তিনজনে অনীশ চৌধুরীর ঘরের দিকে চললেন। ঘরে পৌঁছে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন দেবনাথ। বিছানার ওপর বসলেন দেবনাথ ও কিষাণ আপ্তে। অনীশ চৌধুরী দাঁড়িয়ে রইলেন, বললেন, 'মিস্টার আপ্তে, কোনো সূত্রটুত্র পেয়েছেন নাকি ছাদে?'

'না, এখনও পর্যন্ত নয়।' একটু হতাশ হয়ে জবাব দিলেন কিষাণ আপ্তে, 'তবে আশাকরি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার পর কিছু বলতে পারব।'

'ধন্যবাদ, পরে আবার কথা বলব'খন। অনীশ চৌধুরীর কথায় ঘর ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন কিষাণ আপ্তে।

দিন সাতেক বাদে দেখা পাওয়া গেল হরবিলাস সরকারের। সন্ধ্যা তখন সাতটা। হলঘরে বসেছিলেন হরবিলাস সরকার, সঙ্গে এক আগন্তুক—সাহেবি পোশাকে ফিটফাট। সরু গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ছোট ছোট ভুরু, চোখে একটা চশমা। এছাড়া ঘরে আছেন ইন্সপেক্টর কাপানি, কিষাণ আপ্তে, অনীশ চৌধুরী, চন্দন দেবনাথ, সোমেশ দত্ত, অচলা বর্মা ও কয়েকজন কনস্টেবল।

আগন্তুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হরবিলাস সরকার, মিস্টার চৌধুরী, ইনিই হলেন 'দি লস্ট' উমেশ বর্মা।'

হাত তুলে নমস্কার করলেন উমেশ বর্মা।

'দৈহিক সমস্ত চিহ্নগুলোই আমি মিলিয়ে দেখেছি।' আত্মতুষ্টির স্বরে বললেন হরবিলাস।

এমন সময় অচলা বর্মা ও সোমেশ দত্ত একসঙ্গে নিচু হয়ে তাকে প্রণাম করলেন। প্রশ্নিল দৃষ্টিতে হরবিলাস সরকারের দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। উত্তরে পরিচয় করিয়ে দিলেন হরবিলাস। মৃদু হেসে তিনি আশীর্বাদ করলেন দুজনকে।

হঠাৎ সুরিন্দার কাপানি কতকগুলো কাগজ অনীশ চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, হিয়ার ইজ দি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট।

'ডেথ ইজ কজড বাই স্ট্র্যাংগুলেশন।' কিষাণ আপ্তে বললেন, 'আমাদের ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হল।'

'হ্যাঁ।' জবাব দিলেন সুরিন্দার, 'আর কীচক মারা গেছে মাথার স্কাল ফেটে গিয়ে।'

'আচ্ছা, মিস্টার বর্মার গলায় যে আঙুলের ছাপ পেয়েছেন, তার কপি এনেছেন?' জিজ্ঞাসা করলেন অনীশ চৌধুরী।

'হ্যাঁ, এই নিন।' আঙুলের ছাপের কপিটা বাড়িয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

'হুঁ।' অনীশ চৌধুরীকে চিন্তিত বলে মনে হল। 'কারো সঙ্গে মিলেছে ছাপটা?'

'এখনো মেলাইনি। এখন কার্ডগুলো এনেছি ছাপ নিয়ে যাব বলে।' বলে প্রত্যেকটা কার্ডের পেছনে নাম লিখে তাদের তাদের আঙুলের ছাপ আলাদা আলাদাভাবে নিলেন। উমেশ বর্মাকেও বাদ দিলেন না। তারপর নমস্কার করে বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি ছাপগুলো চেক করে।'

এবার অনীশ চৌধুরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন কিষাণ আপ্তে, 'মিস্টার চৌধুরী, বন্দি আর এই উমেশ বর্মা কি একই লোক?'

'চন্দন,' পরিষ্কার কণ্ঠস্বর অনীশ চৌধুরীর, 'তুমি ভালো করে দেখো তো, বন্দি আর উমেশ বর্মা একই লোক কিনা?'

চন্দন দেবনাথ যেন এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, বললেন, 'না, বরং একেবারেই আলাদা দেখতে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি।' এই বলে উমেশ বর্মার দিকে ফিরলেন অনীশ চৌধুরী, 'মিস্টার বর্মা, আপনাকে আমরা সার্চ করতে চাই, আশাকরি আপনি বাধা দেবেন না?'

একটু ইতস্তত করলেন উমেশ বর্মা। তারপর বললেন, 'করুন।'

তিনজনে সার্চ করতে আরম্ভ করলেন উমেশ বর্মাকে। হঠাৎ তাঁর পাশ-পকেট থেকে একটা লাল রঙা কভারের ডায়েরি বার করে ফেললেন দেবনাথ।

'একী!' বিস্ময়ে অচলা বর্মার চোখ কপালে উঠল।

'বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই মিস বর্মা। বললেন অনীশ চৌধুরী, 'আপনার বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, তাকে আমরা রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমাদের চেষ্টা সফল হয়েছে। রবিশঙ্কর বর্মাকে আমরা রক্ষা করেছি। আর ডায়েরি দেখে আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন আপনার বাবার ডায়েরি, যেটা রবিশঙ্কর বর্মার ছিল।'

'সেকী! এও কি সম্ভব?' বিস্ময়াপন্ন উক্তি হরবিলাস সরকারের।

'এ পৃথিবীতে সবই সম্ভব মিস্টার সরকার। চন্দন, মিস্টার উমেশ বর্মাকে রবিশঙ্কর বর্মায় পরিণত হতে সাহায্য করে।'

একথা বলামাত্রই চন্দন দেবনাথের হাতে উমেশ বর্মার গোঁফ ও দাড়ি উঠে এল। চশমাটা চলে গেল আপ্তের হাতে।

'কনগ্র্যাচুলেশনস মিস্টার বর্মা, সত্যিই আপনার তুলনা নেই।' অভিবাদন জানালেন অনীশ চৌধুরী।

রবিশঙ্কর বর্মা কোনো উত্তর দিলেন না।

'হরবিলাস সরকার কেবল বললেন, 'রবিশঙ্কর, তুমি?'

'মিস্টার বর্মা মাথায় প্রচুর বুদ্ধি রাখেন।' অনীশ চৌধুরী বললেন, 'কিন্তু সামান্য একটা ভুলে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তাছাড়া তার হাবভাব ও কথাবার্তা আমার চেনা-চেনা লাগছিল।

'তার পুরো ইতিহাস বলতে গেলে প্রথম থেকে বলতে হয়। এর মধ্যে কিন্তু মিস্টার বর্মা আমাকে নিজে বলেছেন, কিছু খবর দিয়েছেন কিষাণ আপ্তে আর কিছু আমার অনুমান ও চন্দনের তদন্তের ফলাফল। রণেন্দ্রনারায়ণ বর্মার দুই ছেলে—রবিশঙ্কর বর্মা ও উমেশ বর্মা। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, দুজনের মধ্যে চেহারার অমিল খুবই কম। উমেশ বর্মা যখন যুবক, তখন কী এক কারণে তার সঙ্গে তার বাবার মতান্তর হয়। রণেন্দ্রনারায়ণ উমেশকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। উমেশ বর্মা কিন্তু বুদ্ধিতে কম যান না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

মরবার সময় রণেন্দ্রনারায়ণ তার সমস্ত সম্পত্তি তার বড় ছেলে রবি বর্মাকে দিয়ে গেলেন। উমেশের ভাগে কিছুই পড়ল না। রবি বর্মা আমাকে বলেছিলেন যে, তার বাবার ইচ্ছা ছিল উমেশ যেন অর্ধেক সম্পত্তি পায়। কিন্তু তা মিথ্যা। কেন তিনি বলেছিলেন যে, তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি উমেশ বর্মা পাবেন, তার কারণ আমি পরে বলছি।'

যা হোক, উমেশ বর্মা কয়েক বছর পর সুযোগ পেলেন। তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন এক রাত্রে। দাদাকে গুম করে রেখে দাদার বেশ নিলেন। তার পরেই বিহারে পাড়ি দিলেন। কারণ তাকে এখানে কেউ

চিনবে না। তিনি বিয়ে করেছিলেন—তার একটি মেয়ে হল—অচলা বর্মা।'

'তার মানে, ইনি উমেশ বর্মা?' প্রশ্ন করল সোমেশ দত্ত।

'হ্যাঁ, যাকে আপনারা রবিশঙ্কর বর্মা বলে জানেন।' শুরু করলেন অনীশ চৌধুরী, 'এর পর তার স্ত্রী মারা গেল। জানি না, এতেও শ্রী বর্মার হাত আছে কিনা। অচলা বর্মা ছোটবেলা থেকেই জানলেন, তাঁর পিতার নাম রবিশঙ্কর বর্মা। আমার মনে হয় উমেশ বর্মা গোপন কুঠরিটির সন্ধান জানতেন। সেখানেই দাদাকে বন্দি করে রাখতেন। আর নিজে পাকাপোক্তভাবে রবিশঙ্কর বর্মা সাজলেন। তিনি দাদাকে দেখাশোনার জন্য একটি ঘটোৎকচসুলভ চাকর রাখলেন—তার নাম কীচক। আর মেয়েকে বোঝালেন যে বন্দি হলেন তার কাকা উমেশ বর্মা—মাথা খারাপ। কারণ মিস বর্মা বোধহয় হঠাৎই একদিন ওই কুঠরিটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি তাঁর বাবার অমতে জ্যাঠাকে খাবার দিতে যেতেন।

এ সবই গেল অতীতের কথা। এসব আমি জানতে পারলাম মিস্টার আপ্তের থেকে। তিনি আমাকে বললেন যে, রণেন বর্মার সত্যিই কোনো ইচ্ছা ছিল না যে উমেশ বর্মা সম্পত্তি পায়। তবে কেন রবি বর্মা (?) নানান গল্প ফেঁদে আমাকে বোঝালেন যে, তার বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি সব সম্পত্তি তাঁর ভাইকে দিয়ে যাবেন? এদিকে কিন্তু আসল রবি বর্মা বন্দি। তার মানে উমেশ বর্মা (যিনি রবি বর্মার ছদ্মবেশে অচলগড়ে বাস করছিলেন) রবি বর্মার (আসল) মৃত্যুর পর উমেশ বর্মারই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ফিরে এসে আইনসঙ্গতভাবে তার ভাইয়ের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী (মানে তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী) সম্পত্তি দখল করবেন, যা তার বাবা তাকে দিয়ে যেতে চাননি।

এসব ভেবে উমেশ বর্মা আমাকে একটা চিঠি দেন। এটা আমি বুঝতে পারি মিস্টার সরকারকে লেখা চিঠিতে তার হাতের লেখা দেখে। কারণ আমাকে তিনি যে সংক্ষিপ্ত চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার হাতের লেখা ও দ্বিতীয় চিঠির হাতের লেখা একই।

আমাকে চিঠি পাঠাবার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, তা হল আমার মতো

একজন লোক যদি রবি বর্মার মৃত্যুর সাক্ষী থাকে তবে বোধহয় আর কোনো ঘাটাঘাটি হবে না। তিনি জানতেন আমি নাও আসতে পারি। তাই আমার কৌতূহল সৃষ্টি করার জন্য তিনি কীচককে দিয়ে (কীচকই চিঠিটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দেয় বলে আমার ধারণা) চিঠিটা রহস্যজনকভাবে ফেরত আনালেন। তার চাল বিফলে গেল না। আমি কৌতূহলী হয়ে অচলগড়ে এলাম। তিনি আমার কাছে চিঠি পাঠাবার কথা অস্বীকার করলেন, আর কিছু নয় শুধু ধাঁধা সৃষ্টির জন্য।

এরপর আসছে তার লাইফের ওপর অ্যাটেম্পটের কথা। আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে, প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার সময়ই এক তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তার কথাকেই আমাদের বিশ্বাস করতে হয়েছে। উমেশ বর্মা প্রায় এক বছর ধরে তার প্ল্যান মতো আবহাওয়া সৃষ্টি করেই আমাকে ডেকেছিলেন। তার এই চাল আমি প্রথমে ধরতে পারিনি।

এরপর একরাত্রে চন্দন কীচকের হাতে আহত হয়। কীচক ওকে সন্দেহজনক অবস্থায় হলঘরে দেখে। কারণ এই ছিল গোপন কুঠুরির পাহারাদার। মিস্টার আপ্তে আগেই খবর পেয়েছিলেন যে আমরা আসছি। তাই প্রথম দিন আমরা তাকে দেখি প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে।

একটা কথা বোধহয় আপনারা বুঝতে পারেননি। তা হল কীচকই যে চিঠি চুরি করেছে, তা আমি বুঝলাম কেমন করে? প্রথম দিন আমরা এখানে এসে পৌঁছবার পর উমেশ বর্মারই নির্দেশে কীচক অদ্ভুত অর্থহীন আচরণ করে এবং আমার পিঠে রিভলভারের খোঁচা দেয়। চিঠি যে চুরি করেছে, সে প্রাসাদেই থাকে—এই রকম ধারণা আমার হয়েছিল এবং সে-ও আমার পিঠে রিভলভারের খোঁচা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য পিঠের ঠিক একই জায়গায়। অবশ্য এভাবে ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু পরে যখন মিঃ বর্মার কাছে জানলাম যে কীচক গলার স্বর স্বইচ্ছায় বিকৃত করে সরু গলায় কথা বলে, তখনই আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হল।

উমেশ বর্মা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে ম্যানেজার বদল হয়েছে।

দীনেশ সিংয়ের পরিবর্তে এসেছে এজেন্ট জেড। মিঃ আপ্তেই অনেক কথা ওভারহিয়ার করে অনেক কিছু জানতে পারেন ও আমাকে বলেন। তার সমস্ত গতিবিধির ব্যাখ্যা এতেই পাওয়া যায়।

এরপর আমরা হত্যাকাণ্ডর পর্যায়ে আসছি। চন্দন একরাত্রে বন্দিকে আবিষ্কার করে ফেলে; কিন্তু হঠাৎ সেখানেই তাকে আক্রমণ করে কীচক। তারপরে কী ঘটেছে আমি ঠিক জানি না। কারণ প্রমাণ ছাড়া অনুমানের ওপর কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

—কীচক মারা যায় রাত্রিবেলা। রবি বর্মা (আসলে উমেশ বর্মা) ইচ্ছে করেই বললেন পরের দিন পুলিশে খবর দিতে, আর নিজের ফয়দা ওঠালেন। বন্দি রবি বর্মার গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ঠিকঠাক করে জামা-কাপড় খুলে একটা ধুতি পরতে বাধ্য করলেন। তখন তাকে দেখতে হল উমেশ বর্মার মতো। তারপর তাকে হত্যা করলেন গলা টিপে।

এবার তিনি কীচকের মৃতদেহটা রাইগার মর্টিস সেট ইন করার আগেই বয়ে নিয়ে গিয়ে অতিকষ্টে বর্মটার মধ্যে ঢুকিয়ে বর্ম এঁটে দিয়ে লাশ গায়েব করলেন। তারপর রবি বর্মার মৃতদেহটা ছাদ থেকে উঠোনে ফেলে দিলেন। তারপরের কাজ হল বেড়িটা করাত দিয়ে কাটা ও জানলার গরাদ খুলে লুকিয়ে ফেলা। যেন বন্দি লোকটি এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত করে পালিয়েছে। এরপর উমেশ বর্মা নিজেই কেটে পড়লেন বাড়ি থেকে। ভোরবেলা আমরা আবিষ্কার করলাম, উঠোনে কীচকের বদলে রবি বর্মার লাশ। তাঁরও পরনে কীচকের মতো একখানি ধুতি। কী সুন্দর উচ্চমানের শিল্পকর্ম।

আমরা ভাবলাম অচলা দেবীর বাবা মারা গেছেন। কিন্তু সেখানে মারা গেছেন আসল রবি বর্মা, যাকে আমরা আদৌ চোখে দেখিনি। আর উমেশ বর্মা তখন আত্মগোপন করেছেন। এর দিন সাতেক পরে তিনি ফিরে এলেন উমেশ বর্মা সেজেই—সমস্ত সম্পত্তির দখল নিতে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তার পকেটে আমরা সেই ডায়েরিটাই পেলাম, যেটার মালিক অচলা দেবীর বাবা। তার মানে একই অঙ্গে দুই রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন তিনি। তাঁর প্ল্যানটা খুবই জটিল এবং

নিশ্চিত ছিল। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন রবি বর্মা মারা গেছেন ও উইল করে তার সমস্ত সম্পত্তি উমেশ বর্মাকে দিয়ে গেছেন। এর জন্য তিনি আমার কাছে একটা সেন্টিমেন্টাল গল্পও ফেঁদেছিলেন, কিন্তু সবই বিফলে গেল।'

থামলেন অনীশ চৌধুরী। রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। এমন সময় চেঁচিয়ে উঠলেন উমেশ বর্মা : 'কিন্তু প্রমাণ—প্রমাণ করবেন কেমন করে।'

'এই হল প্রমাণ, দরজার কাছ থেকে জবাব দিলেন সুরিন্দর কাপানি, 'মৃত রবিশঙ্কর বর্মার গলায় আপনার আঙুলের ছাপ।' বলতে বলতে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পালাতে গেলেন উমেশ বর্মা। কিন্তু অনীশ চৌধুরীর ইশারায় দেবনাথ লাফিয়ে উঠে তাকে ধরে ফেললেন।

'রবি বর্মাকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে হত্যা করার জন্য আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।' বলে তার হাতে হ্যান্ডকাপ এঁটে দিলেন ইন্সপেক্টর কাপানি। তারপর তাকে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে চলে গেলেন।

উঠে দাঁড়ালেন অনীশ চৌধুরী : 'মিস বর্মা, এতদিনে অচলগড়-রহস্যের ইতি হল। এবার আমাদের বিদায় দিন—

'সেকী! কাল সকালে যাবেন। আজকের রাতটা থেকে যান।'

'বড় খাওয়া তো পড়েই আছে—আজ থাক।' মুচকি হেসে বললেন দেবনাথ।

অচলা বর্মা ও সোমেশ দত্ত হাসল : 'আপনাদের ঋণ অপরিশোধ্য!'

কিষাণ আপ্তেও হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

যাবার আগে অনীশ চৌধুরী বললেন, 'মিস্টার দত্ত, আশাকরি অচলগড়ে থাকতে আপনাদের আর ভয় করবে না!' বলে একটু হেসে বিদায় নিলেন ওরা।



জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি.টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক। লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে।
পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত বই : পিশাচ সমগ্র, গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র, আমি সিরিয়াল কিলার বলছি, গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র, ডট কম রহস্য, আগুন রঙের বুলেট, ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ, লাশতালাশ, অনীশের সেরা ১০১, অশরীরী ভয়ংকর, ভৌতিক অলৌকিক, পাঁচটি রহস্য উপন্যাস, বারোটি রহস্য উপন্যাস, বিশ্বের সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ, প্রতিঘাত সম্পূর্ণ, তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ, ভয়পাতাল, পাই নিয়ে রূপকথা, বিজ্ঞানের হরেকরকম, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু ইত্যাদি।
প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮), ড: জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), পাই নিয়ে রূপকথা বইয়ের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার (২০১২), দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (২০১৪) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার (২০১৯)-এ সম্মানিত।
প্রয়াণ ২৮ এপ্রিল ২০২১
লেখকের ছবি : গৌতমেন্দু রায়

প্রচ্ছদ সৌজন্য চক্রবর্তী


১ উপন্যাস
১ উপন্যাসোপম কাহিনি
৬ বড় ও ছোট গল্প
এক মলাটে
গোয়েন্দা
অনীশ চৌধুরী
সমগ্র
Arajakata Exclusive
পত্রভারতী
www.patrabharati.com